রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

দেবতত্ত্ব।

ফ্রি এনকোয়্যারি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত।

DEVA TATVA

(THE NATURE OF GODS.)

BY

KISORI LAL ROY

Author of Free enquiry after Truth &c.

PRINTED AND PUBLISHED BY

MATI LAL MANDAL

GUPTA PRESS,

221, Cornwallis Street ;—Calcutta.

1885.

মূল্য আট আনা।

এই পুস্তক ভক্তিনম্রভাবে পূজনীয় পিতাঠাকুর

৺ কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের

নামে উৎসর্গ করিলাম।

পিতৃদেব! এই মুহূর্ত্ত আমার নিকট শুভ বলিয়া বোধ হইতেছে যেহেতুক আমি আমা হইতে জাত, এই পুস্তককে আমার জন্মদাতা আপনার নাম সংযুক্ত করিতেছি। পিতা মাতার ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। আমি আবার দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালেই আপনাকে হারাইয়াছি, সুতরাং সংসারে প্রবেশ করিয়া আপনার কোন সেবা শুশ্রূষা করিতে সমর্থ হই নাই। আপনি জীবিত সময়ে বলিয়াছিলেন যে, কিশোরী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র, উহার ভগবদ্ভক্তি দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি,এ যে দেখি প্রহ্লাদের মত হইল। এই কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, আপনি সংসারে থাকিয়াও যেন অসংসারী ছিলেন। সংসারের সারের প্রতিই আপনার চিত্ত অনুরক্ত ছিল। কিন্তু পোষ্য ব্যক্তিদিগের পোষণেও কিছুমাত্র অবহেলা প্রকাশ করেন নাই। সংস্কৃত বা ইংরাজী না জানিলেও বুদ্ধিমত্তার জন্য আপনার খ্যাতি ছিল। অনেকে বলিতেন ইহাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগুড়ায় আর নাই। কোন সাহেব আপনার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "ক্যা আদমী গিয়া।" কোন ডেপুটী কালেক্টর সরলভাবে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা পূর্ব্বে মূঢ় ছিলাম, কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ই আমাদিগের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত

করিয়া দিয়াছেন।" আপনি যে সহস্র সহস্র প্রজার উপর জমী-দারী উচ্চপদ সূত্রে কর্তৃত্ব করিতেন, তাহারা অদ্যাপিও আপনার জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকে, ও যাঁহার কার্য্য করিতেন তিনিও আপনার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মুহুর্ম্মুহুঃ অশ্রুপাত করতঃ বলিয়া-ছিলেন যে, "অদ্য হইতে আমার কাছারা শোভাহীন হইল।" আপনার উদারতার কথা স্মরণ হইলে চিত্ত পুলকিত হয়। আমি নিরাকারবাদী হইতে ছিলাম কিন্তু আপনি সাকারবাদী হইয়াও আমার যুক্তি শ্রবণে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইতেন না। জ্ঞান আপনার প্রিয় বস্তু ছিল। আপনি এই মাত্র বলিতেন যে, ঈশ্বর সামান্য সাকার নহেন, চিন্ময় সাকার। আমি বলিতাম আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করি না। আপনি বলিতেন যে, অদৃষ্ট শব্দে যাহা দৃষ্ট নয় তাহাই বুঝায়। সুতরাং অদৃষ্ট স্বীকারে অযৌক্তিকতা নাই। যাহা হউক, আপনার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণন আমার উদ্দেশ্য নহে। এই উপলক্ষে আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তি প্রকাশ করিয়া অন্তঃকরণকে চরিতার্থ করিলাম। আপ-নার জীবিতকালে সাধ্যমত আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত পুলকিত হয়।

সেবক

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

এই পুস্তক ভক্তিনম্রভাবে পূজনীয় পিতাঠাকুর

৺ কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের

নামে উৎসর্গ করিলাম।

পিতৃদেব! এই মুহূর্ত্ত আমার নিকট শুভ বলিয়া বোধ হইতেছে যেহেতুক আমি আমা হইতে জাত, এই পুস্তককে আমার জন্মদাতা আপনার নাম সংযুক্ত করিতেছি। পিতা মাতার ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। আমি আবার দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালেই আপনাকে হারাইয়াছি, সুতরাং সংসারে প্রবেশ করিয়া আপনার কোন সেবা শুশ্রূষা করিতে সমর্থ হই নাই। আপনি জীবিত সময়ে বলিয়াছিলেন যে, কিশোরী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র, উহার ভগবদ্ভক্তি দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এ যে দেখি প্রহ্লাদের মত হইল। এই কথা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, আপনি সংসারে থাকিয়াও যেন অসংসারী ছিলেন। সংসারের সারের প্রতিই আপনার চিত্ত অনুরক্ত ছিল। কিন্তু পোষ্য ব্যক্তিদিগের পোষণেও কিছুমাত্র অবহেলা প্রকাশ করেন নাই। সংস্কৃত বা ইংরাজী না জানিলেও বুদ্ধিমত্তার জন্য আপনার খ্যাতি ছিল। অনেকে বলিতেন ইহাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগুড়ায় আর নাই। কোন সাহেব আপনার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "ক্যা আদমী গিয়া।" কোন ডেপুটী কালেক্টর সরলভাবে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা পূর্ব্বে মূঢ় ছিলাম, কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ই আমাদিগের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত

করিয়া দিয়াছেন।” আপনি যে সহস্র সহস্র প্রজার উপর জমী-দারী উচ্চপদ সূত্রে কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাহারা অদ্যাপিও আপনার জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকে, ও যাঁহার কার্য্য করিতেন তিনিও আপনার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মুহুর্ম্মুহুঃ অশ্রুপাত করতঃ বলিয়া-ছিলেন যে, “অদ্য হইতে আমার কাছারী শোভাহীন হইল।” আপনার উদারতার কথা স্মরণ হইলে চিত্ত পুলকিত হয়। আমি নিরাকারবাদী হইতে ছিলাম কিন্তু আপনি সাকারবাদী হইয়াও আমার যুক্তি শ্রবণে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইতেন না। জ্ঞান আপনার প্রিয় বস্তু ছিল। আপনি এই মাত্র বলিতেন যে, ঈশ্বর সামান্য সাকার নহেন, চিন্ময় সাকার। আমি বলিতাম আমরা অদৃষ্ট স্বীকার করি না। আপনি বলিতেন যে, অদৃষ্ট শব্দে যাহা দৃষ্ট নয় তাহাই বুঝায়। সুতরাং অদৃষ্ট স্বীকারে অযৌক্তিকতা নাই। যাহা হউক, আপনার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণন আমার উদ্দেশ্য নহে। এই উপলক্ষে আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তি প্রকাশ করিয়া অন্তঃকরণকে চরিতার্থ করিলাম। আপ-নার জীবিতকালে সাধ্যমত আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত পুলকিত হয়।

সেবক

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

এক শ্রেণীর লোক শাস্ত্রোক্ত রৌপকিক বর্ণনাবলী অরৌপকিক এবং প্রকৃত জ্ঞান করতঃ ভ্রমকূপে পতিত হইতেছেন এবং অন্য শ্রেণীর লোক ঐ সকল বর্ণনা মিথ্যা ও অনর্থক বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়কে দ্রষ্টব্যই জ্ঞান করেন না, কিন্তু ঐ উভয়বিধ জ্ঞানই অনিষ্টদায়ক এবং অনর্থক বিসম্বাদোৎপাদক অতএব আমি যথাশক্তি পশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠা সকলে অনেকটি রূপক বর্ণনার প্রকৃতার্থ প্রকটিত করণে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা স্বীকার্য্য যে অনেক স্থলে রৌপকিক বর্ণনার সহিত প্রকৃত বর্ণনাভানে কল্পনার ও সংশ্লেষ আছে, কিন্তু তাহা স্থূল বিষয়ের প্রকৃতার্থ অবরোধের পর কদাচই অনিষ্টোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। সংশ্লেষের কারণ এই যে শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলেই এই আশয়ে দুই ভাবে শাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছেন যে সাধারণ মনুষ্যগণ রৌপকিক বর্ণনাই প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করতঃ সহজে দেবারাধনা করিতে পারে আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আধ্যাত্মিক অথবা প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াই জ্ঞানগম্য ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত রহেন। তাঁহারা দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে কদাচই প্রকৃতভাবে অল্পজ্ঞ ব্যক্তির উপাস্য জ্ঞান করিতেন না; কিন্তু কাব্যভাব বশম্বদ হইয়া যে সকল সুখসেব্য ও সুখবোধ্য রৌপকিক আকার ও বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহাদিগের ধর্ম্মপথের সুখদায়ক ও প্রবৃত্তিদায়ক জ্ঞান করিতেন সন্দেহ নাই। উপাসনা স্থূল

থাকিতে পারি ইহাতে আর সন্দেহ কোথায়; তবে যদি আমরা অন্য জাতির শাস্ত্রনিহিত সত্যকে অনাদর করি, তবে তাহা অনুদারতা বটে। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কেবল আমাদের শাস্ত্রেই সত্য আছে, আর কোন শাস্ত্রে সত্য নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত মত। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র যতদূর বিস্তীর্ণ এতদূর জগতের আর কোন শাস্ত্রই নহে; ইহা অসঙ্কুচিত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বলা যায়।

দেবতত্ত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা নব্য দিগেরও বিশেষ উপকার হইবে। তাঁহারা দেখিবেন যে লর্ড বেকন হইতে যে দেবতত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়া সার উইলিয়াম জোন্‌স ও ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেও চলিয়া আসিয়াছে তাহারই ঐরূপ মর্ম্মোদ্ভেদের চেষ্টা ভারতবর্ষীয় প্রাচীনগণ দ্বারাও করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থ ও এই ভূমিকা লেখক কৃত প্রকাশ্যমান দেবতত্ত্ব নামক পুস্তক ও আরও দুই একখানি পুস্তক দ্বারা উপরোক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। নব্যগণ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা রূপকের মর্ম্মোদ্ভেদের চেষ্টার কথা শুনিলে অবশ্যই তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রকৃত মূল্যবান্ বিষয়নিচয়ের প্রতি বিশেষ সমাদর ও এদেশের প্রচলিত ব্যবহারাবলীর মধ্যে যেগুলিন প্রকৃত মঙ্গলজনক তাহাদিগের বিলোপ আশঙ্কার দূরীভবন এই উভয়ই হইবে। বিশেষতঃ বিশেষ পরীক্ষা ব্যতিরেকে ভারত প্রচলিত কোন রীতি নীতির উচ্ছেদ চেষ্টা কখনই

দেখা যাইবে না। ঐ সকল রীতি নীতি জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই বিবেচনাতেই নব্যেরা তাহাদিগের পরিবর্ত্তন বিষয়ে হঠকারিতা প্রকাশ করিবে না। এই কথা দ্বারা কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে ভারত প্রচলিত রীতি নীতির মধ্যে কোনটী আর পরিবর্ত্তনযোগ্য নহে। এক কালের উৎকৃষ্ট নিয়মও অন্য কালের অনুপযোগী হইয়া উঠিতে পারে। এক ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে মনু যদি পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া বর্ত্তমান কালে উদিত হইতেন; তাহা হইলে তাঁহার কৃত সংহিতার কোন কোন পরিবর্ত্তন তিনিই অগ্রে আরম্ভ করিতেন। শূদ্রের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া আসিতে পারিলে ঐ বিধি একেবারে রহিত করিতেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে কঠোর নিয়ম দ্বারা জাতিভেদ ও ব্যবসায় ভেদ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে। নিয়মগুলিন ঐরূপ কঠোর না হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক আর কে মেথরের কার্য্য করিতে স্বীকার পাইত? ইচ্ছাপূর্ব্বক আর কে নিকৃষ্ট শ্রেণীতে থাকিতে বাসনা করিত? এখন সভ্যাবস্থায় জগতের মঙ্গল সাধানোদ্দেশে অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য সমাজের অসভ্যাবস্থায় আর কে ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইত? কঠোর নিয়ম না করিলে কেহই আর কৃষক হইতে চাহিত না, সকলেই ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিত। অসভ্যসমাজ শাসন করিতে কঠোর নিয়মেরই আবশ্যকতা হয়। কিন্তু যতই সমাজ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইতে থাকে ততই নিয়মগুলিন কোমলতর হইতে থাকে। অগ্রে চৌরের নাসাচ্ছেদেও

অন্য চোরের ভয় হইত না, এখন একমাস কারাবাসও তাহার পক্ষে সামান্য ভয়ের কারণ নহে। অগ্রে প্রাণহন্তাকে শূলে দেওয়া হইত। এখন ফাঁসি রহিত করিতেও অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাহা হউক পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি ভক্তি-মান্ লোকদিগের দ্বারা হঠাৎ কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হয় না, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে।

দেবতত্ত্বের রূপক ব্যাখা দ্বারা দেশীয় নীতি-শাস্ত্রেরও মহোপ-কার সাধিত হয়। কুলোকেরা বলিতে পারে যে যখন দেব-রাজ ইন্দ্রই গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিলেন, তখন আর আমরা কি প্রকারে পাপের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারি? যখন ব্রহ্মাই আপনার কন্যাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সামান্য প্রাণী মনুষ্য পাপপঙ্কে পতিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যদি দেবতত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে। তাহা হইলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ সকল ঘটনা সত্য সত্যই মহাপাপের কথা নহে, উহারা রৌপকিক বর্ণনা মাত্র। এপ্রকার বোধ জন্মিলে প্রাচীন কালের নৈতিক আদর্শ মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ও শোভা ধারণ করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদিও দেবকার্য্য অনুকরণীয় নহে, কিন্তু দেবোপদেশই পালনীয়, এই বাক্য দ্বারা সুনীতির বল বর্দ্ধন করা হইয়াছে, তথাপি দেবতত্ত্বের প্রকৃতজ্ঞান যে সুনীতির বিশেষ পরিপোষক ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দেবতত্ত্বের বহুল প্রচার হইলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক পর্ব্বোৎসব হওয়ারও সুবিধা হইবেক। তাঁহারা বসন্ত ও শরৎ সমাগমে বাসন্তী ও শারদীয়া দুর্গাপূজাকে রৌপকিক ভাবে

ঈশ্বরের পূজা বলিয়া বুঝিতে পারিলে উক্ত দুই ঋতু সমাগমে ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ উৎসব করিতে আর অনিচ্ছুক হইবেন না। পৌষপার্ব্বণের দিন শস্যোৎসব বা শস্যপ্রদান জন্য ব্রহ্মোৎসব এবং মাঘ মাসে নিরাকারা সরস্বতী বা জ্ঞানদ ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসব করিতেও ক্ষান্ত থাকিবেন না। আরও অনেক উৎসব হইতে পারিবে। এই প্রকার উৎসবের প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলিন কথা লিখিতেছি বোধ করি তাহা কাহারই অসন্তোষজনক হইবে না। জগদ্বিখ্যাত ফরাশিশ দার্শনিক কম্‌টী বিধান করিয়া গিয়াছেন বৎসরের প্রতি দিনই এক একটী মহাত্মার পূজা করা উচিত। তিনি বিশেষ বিশেষ দিনের জন্য বিশেষ বিশেষ নামেরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ পর্য্যন্ত উক্ত মত অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত মত বহুল পরিমাণে প্রচারিত হউক বা না হউক, মহাত্মাজনগণের গৌরব করিতে যে মনুষ্য মাত্রই অনুরাগী ইহা আর কোন বিস্তারিত বর্ণন দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক প্রধান ব্যক্তির জন্মদিনে বর্ষে বর্ষে উৎসব করা হয়; এমন কি এক শতাব্দী পূর্ণ হইলে আবার একটী বিশেষ সমারোহ সম্পন্ন ব্যাপারও সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে অনেক পর্ব্ব ও উৎসবের দিন আছে, কিন্তু তৎসমুদয় আধুনিক কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট অনাদৃত। মনুষ্যের মন এখন কল্পনারাজ্য হইতে সত্যরাজ্যে বহুল পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং কাল্পনিক বিষয়ে এখন আর প্রকৃতরূপে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদিগের দেশে

হিন্দুসমাজে সর্ব্বজনীন কোন উৎসব দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা স্বীকার্য্য বটে অধিকাংশ হিন্দুই এখনও কাল্পনিক বিষয়ানুরাগী কিন্তু সত্যানুরাগী লোকও নিতান্ত অল্প সংখ্যক নহে। কিন্তু কল্পনা-সেবকের দল এখন ক্ষীয়মান এবং সত্যসেবকের দল বর্দ্ধিষ্ণু। এমতস্থলে একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় এখন অসাময়িক হইবে না। বিষয়টী এই, আমাদিগের দেশে অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশের অনেক প্রকার উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের স্মরণার্থ বৎসর বৎসর কোন উৎসব করি না, আর যাঁহাদের জন্য বার্ষিক উৎসব আছে, তাঁহারাও আবার কেবল স্মারিত হওয়ার পরিবর্ত্তে পূজিত হন। অতএব অস্মারিত মহাত্মাদিগের স্মরণার্থ ও পূজিত মহাত্মাদিগের পূজার পরিবর্ত্তে কেবল স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে উৎসব করা আমাদিগের নিকট একান্ত কর্ত্তব্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। রামচন্দ্র ভারতবর্ষের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন; অতএব রামনবমীর দিবস তাঁহার পূজার পরিবর্ত্তে কেবল স্মরণার্থে কোন উৎসব করা সংস্কৃতধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অননুমোদনীয় বিষয় হইতে পারে না। এই প্রকারে জন্মাষ্টমীতে উৎসব করা উচিত, যেহেতুক উহা কংসধ্বংসী ও ধার্ম্মিক পাণ্ডবদিগের পরম সহায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিন। দোলপূর্ণিমার দিন প্রেমভক্তির পরমাদর্শ চৈতন্যদেবের জন্মহয় অতএব উহাও তাঁহার স্মরণার্থ এক উৎসব দিন বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান কালের হিন্দুধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব তো ব্রাহ্মমণ্ডলীতে প্রবর্ত্তিতই হইয়াছে। ইহা যে অতীব উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়াছে তাহা

সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তৎপ্রণীত "ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে একটী শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ৭৪২ শকে অর্থাৎ ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমাতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বৈশাখী পূর্ণিমাতে শঙ্করাচার্য্যের জন্য উৎসব করা অতীব উৎকৃষ্ট ও মহোপকারজনক কার্য্য হয়। উক্ত মহাত্মা নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি দৃঢ়রূপে বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেশ্বর বৌদ্ধদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে নাই; তবে বেদবিরোধী বলিয়া হয়তো তাহাদের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিলনা। যাহা হউক আস্তিকতার দৃঢ় সংস্থাপক বলিয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে বোধ হয় আস্তিক মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। প্রাচীন কালের হিন্দুরা মহত্ত্বের প্রতি কখনই অনাদর প্রকাশ করেন নাই, তজ্জন্যই বুদ্ধদেব যজ্ঞবিধি-নিন্দক হইলেও মহাত্মা বলিয়া তাঁহাকেও এক অবতার মধ্যে পরিগণিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সীতা-নবমী তিথিতে ভারতবাসী সকলেরই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের একটী উৎসব হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, নিত্যা-নন্দ প্রভুর আবির্ভাব অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব, রূপগোস্বামীর তিরোভাব, জীবগোস্বামীর আবির্ভাব, গোপালভট্টের তিরোভাব, হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব, ভীষ্মাষ্টমী এই সকল দিনেও একটী একটী উৎসব হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতি উৎকৃষ্ট নীতি প্রণেতা, জীবহিংসা-বিদ্বেষী মহাত্মা বুদ্ধদেবেরও জন্ম কি মৃত্যু

দিনে একটী উৎসব হওয়া প্রার্থনীয়। মহাত্মা বুদ্ধদেব যজ্ঞজনিত পশুহিংসা দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্র-বিরোধী হইয়াও অতীব উৎকৃষ্ট নীতি সমূহ প্রকটন করিয়া জগতের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। নানক ও কবীরের জন্ম কি মৃত্যু তিথিতেও এক একটী উৎসব হওয়া অতীব উৎকৃষ্ট ব্যাপার। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও আর্য্যভট্টের জন্য এক একটী উৎসব কতদূর বাঞ্ছনীয় বিষয় তাহা এস্থলে আর বহুবাক্য বিন্যাস দ্বারা বর্ণন করিতে হয় না। বাল্মীকিকে সকলেই কবি-গুরু বলিয়া থাকেন, ব্যাস এক অবতারের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছেন ; কালিদাসকে তো ইণ্ডিয়ান সেক্‌সপীয়ারই বলা হইয়া থাকে, (কিন্তু সেক্‌সপীয়ারের মত ইহাঁর জন্য কি উৎসব হয় ?) আর্য্যভট্ট কোপার্নিকাসের অনেক সময় পূর্ব্বেও পৃথিবীর গতি-স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান কালীন কৃতবিদ্যগণের নিকট এক চমৎকারের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার যাঁহার জন্ম কি মৃত্যু দিন এপর্য্যন্তও অনির্ণীত, তাঁহাদের জন্য আর কি প্রকারে উৎসব হইবে। এখন এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

আমি এই পুস্তক রচনা করিতে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হস্তলিখিত অনেক দুষ্পাঠ্য গ্রন্থ আলোচনা ব্যতিরেকে অনেক মুদ্রিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উপাদান লাভ করিবার নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। অনেক ইংরাজী পুস্তকও আলোচনা করিতে হইয়াছে। রঙ্গ-পুরের অন্তর্গত কাকিনীয়া শম্ভূচন্দ্র পুস্তকালয়ে কতকগুলিন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছি। বগুড়া সাধারণ ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের এবং কাকিনীয়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় মহিমারঞ্জন চৌধুরী মহোদয়ের প্রাইবেট পুস্তকালয়ে ইংরাজী পুস্তক আলোচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারে অনেকগুলিন পুস্তক পাঠ ব্যতিরেকে অনেক দিন পর্যান্ত প্রগাঢ় চিন্তাও করিয়াছি। ইহা প্রথমতঃ ইংরাজী ১৮৭২ সালে লিখিতে আরম্ভ করি পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে বিশ্ববন্ধু নামক যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি তাহাতে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কিছু কিছু করিয়া ইহার বিষয় সকল লিখিত হইতে থাকে। বিশ্ববন্ধু ১২৯০ সালের পৌষ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হয়। এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বন্ধ হওয়াতে দেবতত্ত্ব প্রস্তাব ১২৯১ সালের নব্যভারতে পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

এই পুস্তক প্রণয়ন করার সংকল্প অতি সামান্য কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, আমি জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত (তৎকালে বগুড়ার ডেপুটী ইনেসপেক্টারের অধীন) পোতাজিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার থাকা সময়ে একদিন তথাকার একজন টোলের পণ্ডিতের সহিত আলাপ করি। কথোপকথন সময়ে হঠাৎ সেই পণ্ডিত বলিলেন যে "আপনারাও যাহা বলেন আমরাও তো তাহাই বলি। আপনারা বলেন পৃথিবী শূন্যে আছে, আমরাও বলি পৃথিবী অনন্ত নাগের উপরে আছে। শূন্যের নামই অনন্ত নাগ।" আমার আক্ষেপ হইতেছে তাঁহার নামটী বিস্মৃত হইয়াছি। উপরোক্ত কথা আমার চিত্তপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল। আমি অনেক আলোচনা করিয়াও

কথাটা অযৌক্তিক বোধ করিলাম না, প্রত্যুত উহা যথার্থ কথা বলিয়াই অবধারণ করিলাম। তাহার পর অনন্তদেব সম্বন্ধে আরও চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে এক দেবতা হইতে অন্য দেবতার বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ হিন্দুদিগের প্রায় সমগ্র প্রধান দেবতার বিষয়ই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এইকার্য্যে অনেক সময়ও লাগিয়াছে। এই পুস্তকে বৈদিক দেবতার বিষয় প্রায় আলোচিতই হয় নাই, নূতন সংস্করণ আবশ্যক হইলে সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা থাকিল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কেবল দুইজন প্রামাণিক বৈদিক পণ্ডিত আছেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ও ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী। সন্তোষের বিষয় এই যে পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীও দেবতাতত্ত্ব নামধেয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রণীত "দেবতা তত্ত্বে" কেবল কতিপয় বৈদিক দেবতার বিবরণ আছে। তাঁহার ন্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা বৈদিক সমুদয় দেব দেবীর বিবরণ প্রকাশ হইলে অনেক উপকার দর্শিত, কিন্তু বোধ করি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত প্রযুক্ত তিনি শীঘ্র ঐ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছেন না। এ প্রকার স্থলে বলিতে পারা যায় যে বিস্তৃত ভাবে দেবতত্ত্ব আলোচনা বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

কে বলিতে পারে যে কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতার নাম আরোপিক ভাবে ঈশ্বরের নামে পরিণত না হইবে? তখন ব্রহ্মা বলিলে আর চতুর্ম্মুখ কোন দেবতার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবে না, কিন্তু এক অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের কথাই মনে পড়িবে। সম্প্রতি প্রচার নামে যে

যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে কোন বহুদর্শী লেখক দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্বে গায়ত্রীর "সবিতা" শব্দের অর্থ সূর্য্য ছিল, কালক্রমে উহা পরব্রহ্মবাচক হইয়া উঠিয়াছে। ১২৯২ সালের বৈশাখের নব্যভারত নামক মাসিক পত্রে পুরাতত্ত্ববিৎ বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ দেখাইয়াছেন যে বিবাহ শব্দে পূর্ব্বে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া বুঝাইত কিন্তু এখন আর ঐ অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অন্য এক লেখক কুলবিষয়ক এক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে অতি পূর্ব্বে "গোত্র" শব্দে পরিবৃত গোচারণ ভূমি বুঝাইত কিন্তু এখন উহা বংশবাচক হইয়াছে।

অতএব ইহা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত কথা যে কালে ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি শব্দ অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মবাচক শব্দ হইয়া উঠিবে। তখন ঐ সকল শব্দ দ্বারা আর কোন কল্পিত মূর্ত্তি বুঝাইবে না।

কিন্তু ঐ প্রকার ফল দেবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারাই লাভ করা যাইবে। অতএব দেবতত্ত্বের আলোচনা যে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেক দেশের পণ্ডিতেরাই উহাতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন কল্পিত দেবাসুর একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করতঃ অনেক রত্নাদির উৎপাদন করিয়া ছিল, সেই প্রকার এখন জগতের সমবেত সুধীগণ সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতে করিতে অতীব উজ্জ্বল নব নব জ্ঞানরত্ন আহরণে রত রহিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে যেমন সুধালাভ হইয়াছিল তেমনি গরলও উঠিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সিন্ধু মন্থনেও ঐ প্রকারে দ্বিবিধ ফল লাভ হইবে। সত্য-

সুধাও জুটিবে, ভ্রান্তি-গরলও উঠিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গরল ত্যাগ করিয়া অমৃতই আহরণ করিবেন।

বিদেশীয় ও স্বদেশীয় যে কোন পণ্ডিত দেবতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহার মতই যত্নপূর্ব্বক দেখা উচিত। আমাদিগের প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ দেবতত্ত্বনিহিত রূপকের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতেন বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের পর বর্ত্তমান কালে এ বিষয়ে যে সত্যালোক জ্বলিয়াছে তাহা ইউরোপীয়ানেরাই প্রথম প্রকাশিত করিয়াছেন।

কাকিনীয়া,
৬ আষাঢ় ১২৯২ সাল।

শ্রীকিশোরীলাল রায়।

দেবতত্ত্ব

আমাদের দেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে যে প্রকার রূপকের অতি বাহুল্য দৃষ্টি হয়, এ প্রকার আর কোন দেশীয় গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় না। এমন কি, প্রত্যেক অক্ষরের রূপকল্পনা হইয়াছে, যথা—আকারের রূপ, "আকারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে। ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে॥ পঞ্চ প্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কামধেনু তন্ত্র শ্লোক॥ অর্থাৎ আকারের রূপ পরমাশ্চর্য্য, শঙ্খজ্যোতির ন্যায়, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরস্থ পঞ্চ প্রকার বায়ু, প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান আছে। ইহা স্বয়ং কুণ্ডলী অর্থাৎ দেহান্তর্গত শক্তিবিশেষ স্বরূপা। গুহ্য দেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে শাস্ত্র মতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীকেও কুণ্ডলী বলে। প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর রূপ কল্পনা হইয়াছে, যথা—গান্ধার রাগের রূপ, "জটাং দধানঃ কৃতভূতিভূষণঃ কাষায়রাগস্তনুদেহযষ্টিঃ। সযোগপট্টঃকৃতনেত্রমুদ্রো গান্ধার রাগঃ কথিতস্তপস্বী॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীতদামোদর শ্লোকঃ॥ অর্থাৎ গান্ধার রাগ জটা, ভস্ম, কাষায় বস্ত্র ও যোগপট্টযুক্ত ক্ষীণদেহধারী মুদ্রিত-নেত্র তপস্বীর ন্যায়। ধানসী রাগিণীর রূপ কল্পনা;—"নীলোৎপলং কর্ণযুগে বহন্তী। শ্যামা সুকেশী চ সুমধ্যভাগা॥ ঈষৎসহাস্যাম্বুজরম্যবক্ত্রা। সা ধানসী পদ্মসুচা-

রুনেত্রা॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত সঙ্গীতদামোদর শ্লোকঃ॥ অর্থাৎ কর্ণযুগে নীলোৎপলধারিণী ধানসী শ্যামবর্ণা সুকেশী ও ক্ষীণকটিযুক্তা। ইহাঁর ঈষৎহাস্যযুক্ত মুখ ও নয়নযুগল পদ্মের ন্যায়। নাড়ীর রূপকল্পনারও অভাব নাই। যথা—ইড়াচ শঙ্খচন্দ্রাভা তস্যা বামে ব্যবস্থিতা। পিঙ্গলা সিতরক্তাভা. দক্ষিণং পার্শ্বমাশ্রিতা॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত যোগার্ণব শ্লোকঃ। অর্থাৎ ইড়া শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় আর দক্ষিণপার্শ্বস্থ পিঙ্গলা শ্বেত-মিশ্রিতরক্তবর্ণা। স্বরের রূপবর্ণনারও অভাব নাই। হস্তীস্বর তুল্য নিষাদ নামক স্বরের শ্বেতমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ কল্পিত হইয়াছে। দেহাভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী প্রভৃতিরও রূপ কল্পিত হইয়াছে; যথা,—"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভং। মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ। মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপুরং তথোচ্যতে।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত তন্ত্রসার শ্লোকঃ। অর্থাৎ নাভিদেশে মহাপ্রভাযুক্ত বহু তেজোময় মেঘ ও বিদ্যু-তের ন্যায় মণিপুর নামক চক্র আছে উহা মণির মত ছিদ্র বিশিষ্ট, এই জন্য উহার নাম মণিপুর বলা হইয়াছে। জ্বরেরও রূপ বর্ণনা আছে, যথা,—মাহেশজ্বরাকার। "জনকঃসর্ব্বরো-গাণাং দুর্ব্বারো দারুণোজ্বরঃ। শিবভক্তশ্চ যোগীচ সএব বিকৃতা-কৃতিঃ॥ ত্রীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা ষড়্‌ভুজো নবলোচনঃ। ভস্ম প্রহরণোরৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত ভাব প্রকাশ শ্লোকঃ॥ অর্থাৎ মাহেশ জ্বর সর্ব্বরোগের জনক, দুর্ব্বার ও দারুণ। উহা শিবভক্ত যোগী ও বিকৃত আকার বিশিষ্ট। উহার তিন পদ, তিন মস্তক, ছয় হাত ও নয় চক্ষু। উহা কালান্তক-যমের ন্যায় ভয়ানক ও ভস্মরূপ অস্ত্র বিশিষ্ট।

অস্ত্র শস্ত্রকেও রূপ বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যথা—খড়্গের রূপ, "নীলোৎপলসবর্ণাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং কৃশোদরং। প্রাংশুং সুদুর্দ্ধর্ষতরং তথৈব হ্যমিতৌজসং॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মহাভারত শ্লোকঃ। অর্থাৎ খড়্গ নীলবর্ণ, কৃশোদর, মহাতেজা, উচ্চ দুর্দ্ধর্ষ ও তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট। এই প্রকারে সংস্কৃত ভাষাতে রাগ ও অস্ত্রের রূপ বর্ণনা হইয়া তাহাদিগের পুত্রকলত্র বিশিষ্ট বংশেরও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উপাস্য দেবতা লইয়া যে রূপক বর্ণনার চাতুর্য্য প্রকাশে শাস্ত্রকারদিগের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সামান্য স্থলেই যখন রূপক বর্ণনাতে তাঁহারা আসক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন মহানুরাগ আকর্ষক প্রীতিভক্তিবিস্ফারক দেব-বর্ণনাস্থলে যে উহার অতি বাহুল্য লক্ষিত হইবে, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশিত বিষয়। এই সকল বর্ণনাতে তাঁহাদিগের প্রশংসনীয় কল্পনাশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগের আলঙ্কারিক ভাব বুঝিতে সামান্য লোক তো দূরে থাকুক, অনেক পণ্ডিতই অসমর্থ হওয়াতে কল্পনাকেই সত্য বলিয়া তাঁহাদিগের এক দুরপনেয় প্রতীতি জন্মিয়াছে। যাঁহারা ঐ সকল কল্পনার অর্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা যে সত্যের পরম বন্ধু, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আকাশ।

শূন্য অনন্ত, সুতরাং অসীম শূন্যের নামই অনন্ত দেব। অনন্ত নাগের উপর ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড শূন্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বলরামকে অনন্তের অবতার স্বরূপ

বলা হইয়াছে। যথা, বাঙ্গালায় অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে “আপনি অনন্তদেব ব্রজে বলরাম” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য ধবলবং, সুতরাং বলরামকে শ্বেতকায় বলা হইয়াছে। আকাশে নীলবর্ণ প্রকাশ, সুতরাং বলরাম নীলাম্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ সর্ব্বভেদকারী সুতরাং ভেদকারী লাঙ্গলই বলরামের অস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলরামকে ঈশ্বরের সহোদর বলার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্য পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের সদৃশ।

কূর্ম্ম।

কূর্ম্মপৃষ্ঠে মহী অবস্থিত ইহার অর্থ এই যে, কূর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান আকাশোপরি পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের মস্তকোপরি আকাশমণ্ডলকে যেমন কূর্ম্মের ন্যায় দেখা যায় অর্থাৎ বোধ হয় যেন উপরে অতি উচ্চ থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধরণীর সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে; সেইরূপ পৃথিবীর নিম্নদেশেও কূর্ম্মাকার গগণমণ্ডল পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর নীচে কূর্ম্মবং দৃশ্যমান আকাশমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের নাম কূর্ম্ম।

কশ্যপ।

মহাবিদ্বান্ সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন যে, শূন্যের নাম কশ্যপ। আমাদের বিবেচনায় ঐ ব্যাখ্যা প্রকৃত বোধ হয়, তবে একটী কথা এই যে, শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কশ্যপ বলিলে অর্থাৎ শূন্যাধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে কশ্যপ বলিলে এ

বিষয়টী আরও বিশদরূপে বলা হয়। আর কেবল শূন্যকে কশ্যপ না বলিয়া আদি জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্য, অর্থাৎ যে সময়ে সূর্য্যাদি রচিত হয় নাই, সেই সময়ের জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ নাম দিলে কশ্যপতত্ত্ব অধিকতর সঙ্গত হয়, যেহেতু মরীচির পুত্র কশ্যপ।

মরীচি শব্দে জ্যোতিঃ বুঝায়, কিন্তু এ জ্যোতিঃ সূর্য্য-নিঃসৃত আলোক হইতে পারে না, কেন না সূর্য্য আবার কশ্যপের সন্তান। অনন্ত শূন্যকে যেমন অনন্তদেব বলা হইয়াছে, সেই-রূপ আদি জ্যোতিঃ প্রকাশিত শূন্যকে কশ্যপ বলে। কশ্যপ অন্তহীন নহে। কশ্যপের এক স্ত্রীর নাম অদিতি, অদিতি হইতে আদিত্য অর্থাৎ দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের যে শক্তি দ্বারা দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছে সেই শক্তির নাম অদিতি। কশ্যপের অন্যান্য ভার্য্যার নাম, দিতি, দনু, কদ্রু, বিনতা, সরমা, সুরভি, ইলা, সুরসা, ক্রোধবশা, তাম্রা, তিমি, পতঙ্গী, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, মুনি ও যামিনী। অর্থাৎ ঈশ্বরের যে শক্তি দ্বারা দৈত্য অর্থাৎ এক প্রকার দুরাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম দিতি; যে শক্তি দ্বারা অন্য প্রকার দুরাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম দনু, যে শক্তি দ্বারা নাগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম কদ্রু; যে শক্তি দ্বারা অরুণ ও গরুড় অর্থাৎ প্রাতঃ সূর্য্য কিরণ ও প্রবল রৌদ্র উৎপন্ন হই-য়াছে, সেই শক্তির নাম বিনতা; যে শক্তি দ্বারা শ্বাপদগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সরমা; যে শক্তি দ্বারা গো মহিষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সুরভি; যে শক্তি দ্বারা বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ইলা; যে শক্তি দ্বারা

নরখাদক দুরাত্মা মানুষ অর্থাৎ রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম সুরসা ; যে শক্তি দ্বারা সর্প উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ক্রোধবশা ; যে শক্তি দ্বারা শ্যেন গৃধ্রাদি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শক্তির নাম তাম্রা, যে শক্তি দ্বারা জলজন্তুগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম তিমি, যে শক্তি দ্বারা পতঙ্গগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম পতঙ্গী, যে শক্তি দ্বারা অশ্বাদি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম কাষ্ঠা, যে শক্তি দ্বারা গীতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ গন্ধর্ব্বগণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম অরিষ্টা, যে শক্তি দ্বারা অপ্সরা অর্থাৎ নানা প্রকার জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম মুনি, আর যে শক্তি দ্বারা শলভ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম যামিনী।

ইন্দ্র।

ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে কশ্যপ আদিজ্যোতিঃ প্রকাশিত অন্তবৎ শূন্য। এখন ইন্দ্রতত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে। ইন্দ্র আবার কশ্যপ অপেক্ষাও অল্প পরিমিত শূন্য অর্থাৎ কেবল গগণমণ্ডল। তারকাবলীই তাহার সহস্র চক্ষু স্বরূপ, যেহেতুক সহস্র শব্দ অতি বহুত্ব ব্যঞ্জক মাত্র ; এ প্রকার স্থলে উহাতে কেবল সহস্র সংখ্যাই বুঝায় না। ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র ও বাহন ঐরাবত এই দুইটাতে বজ্র ও মেঘ বুঝায়। ঐরাবত মেঘ, আর সৌদামিনী তাহার স্ত্রী, এই জন্য বিদ্যুৎকে ঐরাবতী বলে। ইন্দ্রের এক নাম মেঘবাহন, ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মেঘই ঐরাবত রূপে কল্পিত হইয়াছে। ইরা শব্দের এক অর্থ জল, ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, ইরাবৎ শব্দোৎ-

পন্ন অস্মাবর্ত্ত জলবৎ, অর্থাৎ জলযুক্ত কোন পদার্থ, অর্থাৎ মেঘ। ইন্দ্রের এক নাম গোত্রভিৎ অথবা পর্ব্বতভিৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রের অস্ত্রস্বরূপ বজ্র দ্বারা পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করা যায়। ইন্দ্রের এক নাম বৃত্রহর, অর্থাৎ তিনি বৃত্র নামক অসুরকে হত করিয়াছেন। মহাবিদ্বান ম্যাক্সমূলার বলেন যে, বৃষ্টিনিবারক কোন অবস্থাপন্ন মেঘই বৃত্র, বজ্র দ্বারা তাহার বৃষ্টিনিবারকতা-শক্তি নিরাকৃত হইয়া জলবর্ষণ হয়, এই জন্য ইন্দ্রকে বৃত্রহা বলা যায়। গগনমণ্ডল অতি মনোরম পদার্থ, সুতরাং ইন্দ্রের বনও মনোহর হওয়া উচিত, অতএব ইন্দ্রের উপবনকে নন্দনকানন বলা হইয়াছে। গগনমণ্ডলের শক্তির নামই শচী। রামধনু গগনমণ্ডলে উদিত হয় বলিয়া উহারি নাম ইন্দ্রধনু। বোধ হয় বিদ্যুদ্বিরহিত মেঘই উচ্চৈঃশ্রবা রূপে কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গগনমণ্ডলে অধিষ্ঠিত অবস্থায় ঈশ্বরকে ইন্দ্র বলে, অথবা ইন্দ্র গগনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ব্যাখ্যাত করিয়াছি যে, অনন্ত শূন্যের নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য বিশেষের নাম কশ্যপ এবং আরও অল্প পরিমিত শূন্যের নাম ইন্দ্র। কিম্বা ইহা বলিলেই বিষয়টী অধিকতর স্পষ্ট হয়, অনন্ত-শূন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অনন্তদেব, অন্তবৎ শূন্য-বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কশ্যপ এবং আরও অল্প পরিমিত শূন্যের অর্থাৎ গগনমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ইন্দ্র। অথবা ইহা বলিলে শূন্যতত্ত্ব যৎপরোনাস্তি বিশদভাবে ব্যক্ত হয় যে, কেবল অনন্ত আকাশব্যাপী অর্থে ঈশ্বরের নাম অনন্তদেব, কেবল অন্তবৎ আকাশব্যাপী অর্থে তাঁহার নাম কশ্যপ এবং কেবল গগনমণ্ডলব্যাপী

অর্থে তাঁহার নাম ইন্দ্র। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় প্রশংসনীয় কৌশল সহকারে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় একটী গল্পের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, ইন্দ্র গোতমললনা অহল্যাকে হরণ করিয়াছিল। সামাধ্যায়ী মহাশয় ইহার অর্থ করেন যে, এ স্থলে ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য, গোতম শব্দে চন্দ্র এবং অহল্যা শব্দে রাত্রি বুঝায়, সুতরাং ইন্দ্র অহল্যাকে হরণ করিল, ইহার এই অর্থ স্থির থাকিতেছে যে, সূর্য্য রাত্রি হরণ অর্থাৎ দূর করে। আমরা এ বিষয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত নহি। আমাদিগের মতে ইন্দ্র এস্থলে গগনমণ্ডল, গগনমণ্ডল গোতম অর্থাৎ চন্দ্রের পত্নী অহল্যাকে, অর্থাৎ রজনীকে হরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ তৎসহ একত্রে মিলিত হইয়াছিল। আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই লাভ হয় যে, উক্ত সমাগম নিবন্ধনই গগনমণ্ডল প্রাকৃতঃ সহস্র চক্ষু অর্থাৎ তারারূপ বহু সংখ্যক চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা প্রদর্শিত হয়, আর ইন্দ্র শব্দের সাধারণ অর্থই ঠিক থাকে। কেবল রজনী সমাগমেই গগনে তারারাজি বিরাজিত হয়। আর চন্দ্রের অনুপস্থিতি সময়েই তারকা সকল উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।

পবন।

পবন সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছুই নাই, তবে তাহার এই মাত্র বর্ণনা আছে যে, সে মৃগারূঢ় ও ধনুকধারী। হরিণ ও বাণ উভয়ই দ্রুতগামী, সুতরাং কবিকল্পনা পবনের বাহন ও অস্ত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে মৃগ ও ধনুককে স্থির করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি সঙ্গত। পবনের অর্থ এই হইল যে,

ঈশ্বরকে কেবল বায়ুব্যাপী অর্থে ধরিলে তাঁহার নাম পবন। ইন্দ্র অদিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পবনকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূন্যে অবস্থাভেদে অবস্থান হেতু বায়ু উনপঞ্চাশ প্রকার হইয়াছে। গরুড় পবনের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় একটী গল্প আছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবন বহু চেষ্টা করিয়াও সুমেরুর কোন শৃঙ্গপাতনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু গরুড় পাখসাটে সেই শৃঙ্গ নিপাতিত করিয়াছিল, ইহাতে পবন অপেক্ষাও গরুড়কে বলবান বলা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গরুড়ের অর্থ প্রবল রৌদ্র, সুতরাং উক্ত গল্পের এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে বায়ুদ্বারা পর্ব্বত শঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, কিন্তু উত্তাপের দ্বারা উহা পর্ব্বত হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। এস্থলে সূর্য্য ও মনুষ্যের প্রসিদ্ধ গল্পটী আমাদের মনে পড়িল। সূর্য্য ও পবন পরস্পর অধিকতর বলবান বলিয়া স্পর্দ্ধা করাতে কোন বস্ত্রাবৃত মনুষ্যের বস্ত্র পরিত্যাগ করান দ্বারা তাহারা আপন আপন বল পরীক্ষা করা স্থির করিল, পবন মহাঝড় উঠাইয়াও মনুষ্যকে বস্ত্র ত্যাগ করাইতে পারিল না, কিন্তু সূর্য্য ক্রমশঃ উত্তাপ বৃদ্ধি করাতে তাহা মনুষ্যের অসহ্য হওয়াতে সে আপনার গাত্র বস্ত্র উন্মোচিত করিল। যাহা হউক পবন অত্যন্ত বলবান্।

সরস্বতী।

আমরা কিছু পূর্ব্বে বায়ুতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে নিযুক্ত ছিলাম। এখনবায়ু সাহায্যে উদ্ভূত বাক্যের ঈশ্বরী স্বরূপ সরস্বতী তত্ত্ব

নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বাক্যের সহিত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আছে, অতএব সরস্বতী কেবল শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবতাও বটেন। বেদ ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যা ও বাক্যের অধিপতি এই অর্থে ঈশ্বরের নাম সরস্বতী। বেদের অধিপতি অর্থে তাঁহার নাম সাবিত্রী। সরস্বতীকে শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠিতা, শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা ও শ্বেতবীণাধারিণী বলার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যাদ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, সুতরাং অজ্ঞান অন্ধকার স্বরূপ, বিদ্যা আলোক স্বরূপ, এবং আলোক স্বরূপ প্রকাশে শ্বেতবর্ণের আবশ্যক। সরস্বতী পুস্তক হস্তা, কারণ পুস্তক সমূহই জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরাকারা সরস্বতীর রূপ কল্পনা করিতে হইলে তাঁহাকে শ্বেতবর্ণাদি বিশিষ্টা বলিয়া কল্পনা করিলেই প্রশংসনীয় রূপক হয়। "ধর্ম্মতত্ত্বের" কোন লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, মাঘমাসে সরস্বতী পূজা বিহিত হওয়ার কারণ এই যে, সেই সময়ে বসন্তের ছায়া পড়ে এবং বসন্ত কালই সঙ্গীত বিলাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। বাস্তবিক সঙ্গীতেশ্বরীর আরাধনা বসন্তের প্রারম্ভেই হওয়া উচিত। সরস্বতী যে শাস্ত্রকারগণের মতে ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র; তাহা "বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী" ইত্যাদি বাক্য আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

অগ্নি।

অগ্নিকুণ্ডমধ্যস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আসনে অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণবৎ এবং পরিধান বস্ত্র অরুণবর্ণ, মস্তকে সপ্তশিখা এবং পদতলে অজবাহন। অগ্নির মস্তকে

সপ্তশিখা কল্পনার কারণ এই যে, উহার সাতটী শিখা আছে, যাহাদিগকে কখন কখন সপ্ত জিহ্বা বলা হয়। এদেশে অতি প্রাচীন কালাবধি অগ্নির অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে অতি বাহুল্য ভাবে নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। এবং সকল যজ্ঞেই অগ্নিকে আহুতি প্রদান করা হইত, এই জন্য অগ্নির নাম হব্যবাহন, হুতভুক্ ও বীতিহোত্র হইয়াছে। পূর্ব্বে অতি যত্নপূর্ব্বক অনেকের গৃহে অগ্নি রক্ষিত হইত, তাহাতে প্রতিদিন আহুতি প্রদত্ত হইত। প্রথমতঃ অগ্নি অতি অল্পে অল্পে জ্বলিতে থাকে, এই জন্য তাহার আসন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; অগ্নিকে অজবাহন বলার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি অতি তেজস্বী এবং ছাগলও অত্যন্ত তেজোময় জন্তু, সুতরাং অগ্নির বাহন কল্পনা করিতে হইলে ছাগলকে উপযুক্তরূপেই নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। অগ্নিব্যাপী অর্থে ঈশ্বরের নাম অগ্নি। স্ত্রীভাবে অগ্নির নাম স্বাহা।

সূর্য্য।

সূর্য্য রক্তবর্ণ, পদ্মহস্ত ও সপ্তাশ্ব সংযুক্ত একচক্র রথে অধিষ্ঠিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যমণ্ডলকে একটী চক্রের আকৃতিতে দৃষ্ট হয়, উহার সাতটী কিরণ আছে এবং উদয় মাত্রই পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এস্থানে বক্তব্য এই যে, অনেকে বিবেচনা করেন আলোকে যে সাতটী বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রথমতঃ সার আইজাক নিউটন কর্ত্তৃক প্রিজম্ নামক স্ফটিক দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা যে ভ্রমাত্মক, তাহা

সূর্য্যের সপ্তাশ্ব কল্পনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে, এবং এই সপ্তাশ্ব কল্পনা নিউটনের অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলব্যাপী এই অর্থে ঈশ্বরের নাম সূর্য্য।

চন্দ্র।

চন্দ্র, কুন্দ পুষ্পের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রথারূঢ়। চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করে এবং তন্মণ্ডলও চন্দ্রাকার, সুতরাং চক্রবিশিষ্ট রথকেই তাহার বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। অনেকের মতে চন্দ্র যে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, এই মতটী আধুনিক। কিন্তু "সুষম্নানামকোরশ্মিঃ পুষ্ণাতিশিশিরদ্যুতিং" এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, উক্ত মত প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি সামবেদেও উহার উল্লেখ আছে। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কৌথুমী শাখার অনুবাদে লিখিয়াছেন " হে পবমান (চন্দ্র) তুমি আমাদিগকে স্নিগ্ধ রশ্মিতে সেচন করিয়া থাক এবং তুমি সূর্য্যের দীপ্তিযোগে দীপ্তিমান্ হইয়া নৈশ-অন্ধকার নাশ করিতেছ ইত্যাদি।" একদা চন্দ্র, বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিল, সেই পাপে সে কলঙ্কী হইয়াছে। এই পৌরাণিক বিবরণের কোন বাস্তবিক মূল থাকিতে পারে। হয়ত পুরাকালে ভারতবর্ষে এপ্রকার কোন জ্যোতিষিক মত প্রচলিত ছিল যে, তদনুসারে তারা নামক কোন বিশেষ নক্ষত্র অথবা বৃহস্পতি গ্রহেরই চন্দ্রের সংযোগ বিশেষে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে। চন্দ্রের উৎপত্তি,

তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এক মতে সমুদ্রমন্থনে, অন্য মতে বিধাতার মননে, এবং তৃতীয় মতে অত্রি মুনির চক্ষুদ্বারা চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। "মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন" এই বচনে মনদ্বারাই চন্দ্রের উদ্ভব সূচিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত তিন স্থলেই, বিধাতার মনন, চন্দ্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, যেহেতুক ঐ তিন প্রকারেই বিধাতার ইচ্ছা সঞ্চালন আবশ্যক। অত্রি মুনিকে শিবাবতার বলা হইয়াছে, সুতরাং অত্রিনেত্র হইতে চন্দ্রের উদ্ভব বলিলে, এই বুঝায় যে, শিবের নেত্র হইতে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। চন্দ্র শিবের নেত্রই বটে যথা "চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতমিত্যাদি।" ইতি তন্ত্রসার শ্লোকার্দ্ধঃ। চন্দ্র, অর্ক ও অগ্নি, মহাদেবের এই তিন চক্ষু। অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটী নক্ষত্রকে চন্দ্রের স্ত্রী কল্পনা করিয়া রোহিণীনক্ষত্র ও চন্দ্র সম্বন্ধীয় একটী পৌরাণিক বিবরণ আছে। তাহা এই, চন্দ্র অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা রোহিণীকেই সমধিক প্রীতি করে, এই দেখিয়া রোহিণীর ভগিনীগণ তাহাদিগের, পিতা দক্ষের নিকট, আপন আপন মনস্তাপ জ্ঞাপন করিলে, দক্ষ অভিশাপ দিলেন, চন্দ্র ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইবে। পরে চন্দ্র আবার উক্ত স্ত্রীগণকে সমুচিত প্রীতি করিতে লাগিল দেখিয়া, তাহারা দক্ষকে শাপ মোচন করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু দক্ষ বলিলেন আমার কথা ব্যর্থ হইবে না, অতএব আমি বরও প্রদান করিতেছি যে, চন্দ্র ক্রমান্বয়ে ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে বোধ হয়, পুরাকালে ভারতবর্ষে এ প্রকার মত প্রচলিত ছিল যে, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি, নক্ষত্র ও চন্দ্রের সম্পর্ক বিশেষ দ্বারা চন্দ্রের

হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিত। চন্দ্রমণ্ডলব্যাপী, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম চন্দ্র।

নক্ষত্র।

দক্ষ, অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি আপনার সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আর রূপকের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হয় না, কেননা অশ্বিনী প্রভৃতি যে নক্ষত্র ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। চন্দ্রের সহিত উহাদিগের বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া, উহাদিগকে তাহার স্ত্রী বলা হইয়াছে। অগ্নিবর্ণ ছয়টী তারাই কৃত্তিকা, এই কৃত্তিকা দেবীদের নামানুসারেই স্কন্দের নাম কার্ত্তিকেয় ও ষড়ানন হইয়াছে। কার্ত্তিকেয় ছয়জন কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধ্রুব একটী বিখ্যাত নক্ষত্র আর বিষ্ণুপুরাণে উত্তানপাদকেও নক্ষত্র পুঞ্জের এক অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর সাতটী নক্ষত্রই সাতজন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা——মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও অঙ্গিরা। এই সাত নামে সাতজন প্রকৃত মুনি স্বীকার করাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কেননা যে ঋষিসপ্তক সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঐ সপ্ত তারাকে আপনাদের নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনৈশ্চর, ইহারা যে তারা ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ও নক্ষত্র বিশেষ। সৌরভাদ্রের সপ্তদশ দিবসে নক্ষত্ররূপে অগস্ত্যোদয় হয়, সুতরাং অগস্ত্য শব্দে এক নক্ষত্রও বুঝায়।

গরুড়।

ইতিপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রৌদ্রের নামই গরুড়। অরুণ প্রাতঃকালীন সূর্য্য-জ্যোতিঃ, সুতরাং প্রবল রৌদ্র অর্থাৎ গরুড়কে যে তাহার কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, গরুড়কে সকলে অগ্নিবর্ণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। উহাতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গরুড়ের শরীর ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। রৌদ্র প্রকাশেরও এই নিয়ম। প্রথমতঃ অল্প অল্প রৌদ্র হয়, তাহার পরে উহা ক্রমে ক্রমে অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতেও গরুড়ের পক্ষের কিছু হানি হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বজ্রাঘাত দ্বারাও সূর্য্য-জ্যোতির কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে পারে না। গরুড় চক্ষুর নিমেষেই অনেক দূর গমন করিতে পারিত, ইহাতে এই সূচিত হইয়াছে যে, জ্যোতির গতি যৎপরোনাস্তি দ্রুতবেগবিশিষ্ট। এই গতির নিমিত্তই গরুড় ও অরুণকে পক্ষী বলা হইয়াছে। সুমেরু পর্ব্বতের উপর, গরুড় ও পবনের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, পবনের ভয়ানক পরাক্রমেও সুমেরু পর্ব্বতের কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু গরুড়ের পাখসাটেই উহার এক শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে অভিপ্রেত হইয়াছে যে, এ প্রকার স্থলে বায়ু অপেক্ষা উত্তাপের শক্তিই অধিকতর ফল প্রসব করে। এ পর্য্যন্ত গরুড় সম্বন্ধে কেহই কিছু ব্যাখ্যা করেন নাই; কিন্তু বোধ করি গরুড়কে যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ বলিয়া ব্যাখ্যা

করিলাম, ইহাতে কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কোন পণ্ডিতই কিছু আপত্তি করিবেন না।

কার্ত্তিকেয়।

কেবল সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কার্ত্তিকেয়। যুদ্ধদেবের অতি তেজোময় হওয়া উচিত, সুতরাং কার্ত্তিকেয়কে অগ্নির পুত্রও বলা হইয়াছে। কৃত্তিকা নামক অগ্নিবর্ণ ছয়টী নক্ষত্র, ঐ অগ্নির পুত্র অথবা মহাদেবের পুত্রকে পালন করিয়াছিল, এই জন্য তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় ও ষড়ানন হইয়াছে। অগ্নির মত তেজোবিশিষ্ট দেবতার অগ্নি-বর্ণা পালয়িত্রী কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত। যোদ্ধা ও সুন্দরবর্ণ ময়ূরই কার্ত্তিকেয়ের উপযুক্ত বাহন। যোদ্ধারা উত্তমরূপে সজ্জিত, অর্থাৎ বেশভূষাদিবিশিষ্ট হইয়া উত্তম বাহনেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে; সুতরাং যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের রূপ ও বাহনাদি কল্পনা করিতে হইলে, তাঁহাকে অতি সুন্দর পুরুষ ও সুন্দর বাহনে আরূঢ় বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়।

অশ্বিনীকুমার।

আমার যেন স্মরণ হয়, ম্যাক্সমুলর অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উষা ও গোধূলি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাই আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সূর্য্যের যমজ পুত্র বলা হইয়াছে, ও যমজ পুত্রের প্রায় একরূপ হয়, এবং উষা ও গোধূলিও প্রায় একরূপ। উষাতেও যেমন অস্পষ্ট আলোক

গোধূলিতেও সেই প্রকার। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঊষা ও গোধূলি এই কালদ্বয় স্বাস্থ্য-জনক, ভ্রমণের প্রশস্ত সময়। প্রত্যুত স্বাস্থ্যলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা ঊষা ও গোধূলি সময়ে, বিশেষতঃ ঊষাকালে ভ্রমণ অত্যন্ত উপকারজনক জ্ঞান করিয়াই, তাহা করিয়া থাকে। আর উত্তরমুখস্থা অশ্বিনীরূপা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার দুই নাসিকা দিয়া সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিক দ্বারা, কল্পিত অশ্বিনীর দুই নাসিকা কল্পিত হইয়াছে এবং ঊষা পূর্ব্বদিক্ হইতে ও গোধূলি পশ্চিমদিক হইতে উৎপন্ন হয়।

বরুণ।

কেবল জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম বরুণ। বরুণ পাশহস্ত, মৃগারূঢ়, শঙ্খস্ফটিকবৎ বর্ণযুক্ত ও মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বরুণকে পাশহস্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল জীব জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে, অথবা অনেকক্ষণ জলমগ্ন থাকিয়া কষ্ট পায়, তাহাদিগের এ প্রকার বোধ হয় যেন কেহ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতেছে। জল দ্রুতগামী, সুতরাং বরুণ মৃগারূঢ়। জলের বর্ণ ধবল, সুতরাং বরুণ শঙ্খস্ফটিকবৎ বর্ণযুক্ত, এবং জলের বেগ প্রবল এইজন্য বরুণ মহাবল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গঙ্গা।

কেবল গঙ্গানদী ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম গঙ্গা। গঙ্গা মৎস্যগর্ভা, সুতরাং ইনি মকরের

উপর অধিষ্ঠিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কখন কখন জলমাত্র অর্থেও গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা "জলমেব জহ্নুতনয়া ভূরেব বারাণসী।" অর্থাৎ জলই গঙ্গা ও পৃথিবীই কাশী।

দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ও কালী।

মূল প্রকৃতিকে, ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি বা মায়া-শক্তি বলে। পঞ্চভূতাদি জড় পদার্থ সমষ্টিকেও প্রকৃতি বলে। দুর্গা মূল প্রকৃতির এক অংশ। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ও দুর্গতিনাশকারী, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম দুর্গা। জড় জগৎ পর্ব্বত সকল দ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আর পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতএব দুর্গাকে পার্ব্বতী ও হিমালয়নন্দিনী বলে। গঙ্গাকেও হিমালয় নন্দিনী বলে, যেহেতু উহা হিমগিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত রহিয়াছে। এই জন্যই দুর্গাকে গঙ্গার সপত্নী কহে। কিন্তু মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থেই সচরাচর ঈশ্বরকে দুর্গা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দশ বাহুই সেই মহাশক্তির পরিচায়ক। পরাক্রমাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহই উপযুক্ত বাহন। দুর্জ্জন বা অসুরেরাই জগতের প্রধান দুর্গতির কারণ, অতএব দুর্গা অসুরনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াই, এক প্রকারে দুর্গতিনাশিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন নানা প্রকার দুর্গতি আছে, তখন অন্য প্রকার দুর্গতিনাশিনী অর্থেও দুর্গাকে দুর্গা বলা যায়। শারদীয়া দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয়াদির মূর্ত্তিও প্রদর্শিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তি হইতেই যখন যুদ্ধশক্তি উৎপন্ন হয়, তখন যুদ্ধদেবতা কার্ত্তিকেয়কে দুর্গার পুত্র

বলা যায়। যখন ঐ মহাশক্তি হইতেই দুর্গতি ও বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন সিদ্ধিদেবতা গণেশও দুর্গার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই প্রকারে বাক্-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি দ্বারাও দুর্গতি দূর হয় বলিয়া এবং উহা মহাশক্তির এক অংশ বলিয়া, সেই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীও দুর্গার সহিত প্রদর্শিত হয়। মহাশক্তির অংশ, এই বলিয়া শোভা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীও দুর্গার সমভিব্যাহারে পরিদৃষ্ট হয়। মহাশক্তি বলিয়া দুর্গাকে, নিদ্রা, ক্ষুধা, লজ্জা, তুষ্টি, অনলের দাহিকা শক্তি, ভাস্করের প্রভাশক্তি, জলের শীতলতা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যশক্তি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়শক্তি, তপস্বীর তপস্যাশক্তি, ক্ষমাবানের ক্ষমাশক্তি, ধরণীর ধারণী ও শস্যপ্রসবিনীশক্তি প্রভৃতি বলিয়া স্তব করা হইয়াছে ও হইয়া থাকে। শাস্ত্র-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মৃণ্ময়ী দুর্গা-মূর্তিকে দুর্গা জ্ঞান করে, কিন্তু জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরকেই অবস্থা বিশেষে দুর্গা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, "গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী। সাবিত্রী চ স্মৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা।" অর্থাৎ মূল প্রকৃতিকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী। দুর্গাকে তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হইয়াছে। যথা "তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" হিন্দুশাস্ত্রের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাতে ঈশ্বরের নাম লইয়া অতি প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। যথা, নারায়ণের সহস্র নাম, শত নাম, ষোড়শ নাম, অষ্ট নাম ইত্যাদি। এই প্রকারে দুর্গারও সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের নাম লইয়া এত প্রসঙ্গ করা হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই একটী পৃথক্ নাম লওয়ার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা "ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনেচ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥" ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে। যথা "অব্যাদ জোঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ। যজ্ঞোচ্যুত কটিতটং জঠরং হরাস্যঃ।" ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন কালের রক্ষার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নাম বিহিত হইয়াছে। যথা "পায়ান্মধ্যং দিনে বিষ্ণু প্রাতর্নারায়ণোঽবতু। মধুহাচাপারাহ্ণেচ সায়ং রক্ষতু মাধবঃ॥" ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে। যথা, মানসহ্রদে মৎস্য, হস্তিনাপুরে গোবিন্দ, কুরুক্ষেত্রে কুরুধ্বজ, হিমাচলে শূলবাহু, অবন্তিনগরে বিষ্ণু, বারাণসীতে কেশব, মর্ত্তালোকে অগস্ত্য, ভুবর্লোকে গরুড়, স্বর্গলোকে বিষ্ণু, জম্বুদ্বীপে চতুর্ব্বাহু ইত্যাদি। শিব ও রাধিকারও সহস্র নাম কথিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময়ে ঈশ্বরের নামের যে প্রকার অত্যধিক আলোচনা হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই। এবিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সহিত হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে, অনর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ অপরাধ। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে, হেলায় নাম গ্রহণও মহা পুণ্যজনক। চৈতন্যদেবের সময়ে মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুর প্রত্যেক দিবসে তিন লক্ষবার হরিনাম জপ করিতেন। অদ্যাপিও অনেক হিন্দু, প্রতিদিন শত শতবার ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকেন। নাম জপের এত প্রাবল্য ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশেই

দেখা যায় না। ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়েরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহত্ব অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেমিকত্বই অধিক ভাল বাসে।

দুর্গাকে প্রকৃতির অংশ বলিয়া ও শাস্ত্রে অনেক স্থানে তাঁহাকে স্বয়ং প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতিকে কথন কথনও কৃষ্ণ ও রাধা, কথন কথন শিব ও দুর্গা এবং কথন কথন লিঙ্গ ও যোনি বলা হইয়াছে, যোনি পূজা বলিলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কথনই তাহা সে ভাবে গ্রহণ করে না। উক্তস্থলে সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সমবায়ের নামই যোনি এবং ঐ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি।

পুরুষের যে প্রকার দশাবতার বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃতিরও দশাবতারের বর্ণনা আছে। যথা, "কৃষ্ণরূপা কালিকাস্যাৎ রামরূপাচতারিণী। বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিস্যান্মীনো ধূমাবতীভবেৎ॥ ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃস্যাদ্বরাহশ্চৈব ভৈরবী। সুন্দরী যামোদগ্যঃস্যাদ্বামনো ভুবনেশ্বরী॥ কমলা বৌদ্ধরূপাস্যাৎ দুর্গাস্যাৎ কল্কিরূপিণী।" ইত্যাদি। ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র।

ছান্দোগ্যোপনিষদে মহাশক্তি বিষয়ক একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। যথা, এক সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ মোহবশতঃ আপনাদিগকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতেছিলেন ; তদ্দর্শনে ভগবান্ এক অনির্ব্বচনীয় কোটিচন্দ্র সূর্য্যসন্নিভ জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ু উত্তর করিলেন। আমি মাতরিশ্বা,

আমি সকল বস্তুকেই উড়াইতে পারি। জ্যোতিঃপুঞ্জ এক তৃণ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন এই তৃণটুকু উড়াও। বায়ু কোনক্রমেই তাহা উড়াইতে না পারিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎপর অগ্নি, উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে; উত্তর করিলেন, আমি অনল, আমি সকল বস্তুই দগ্ধ করিতে পারি। জ্যোতিঃপুঞ্জ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত তৃণ দগ্ধ করিতে বলিলে, অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে অপারগ হইয়া লজ্জিত হইলেন। কাত্যায়নী তন্ত্রের মতে এই জ্যোতিঃপুঞ্জ পরে চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রীরূপে বিনয়াবনত দেবগণের সমক্ষে কিয়ৎকাল প্রকাশিত থাকিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই জগদ্ধাত্রীও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ। শোভা, শক্তি ও জ্ঞানদাত্রীত্ব সূচনার্থে ইনি জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কালীকে দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্না বলা হইয়াছে। যথা, "দুর্গার ললাটে জাতা জলদবরণী।" কালী দুর্গার ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ বাক্যের এই তাৎপর্য্য যে, ললাটের সঙ্কোচনেই ক্রোধ ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া, সদা ক্রোধান্বিতা, রণরঙ্গিনী করাল-বদনা কালীকে ললাট-সম্ভবা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক কালীও দুর্গার রূপান্তর বিশেষ। ক্রোধাবস্থাপন্না শক্তিকেই কালী বলা হইয়াছে। ভয়ানক ভাবান্বিতা বিশ্ব-ব্যাপিনী শক্তি, এই অর্থে ঈশ্বরের নাম কালী। এই জন্য কালীর বিবিধ প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা ও ভৈরবী, এ সকলেরই অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। পাঠক-গণের জ্ঞানার্থে একটী ধ্যান দেওয়া যাইতেছে। উমার ধ্যান—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং

দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥ সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং॥ মহামেঘপ্রভাংশ্যামাং তথাচৈবদিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং॥ কর্ণাবতং সতাংনীতশবযুগ্ম ভয়ানকাং। ঘোর দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং॥ শবাণাং কর সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতা-ননাং॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্ক-মণ্ডলাকার লোচনং ত্রিতয়ান্বিতাং॥ দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপীমুক্তা-লম্বিকচোচ্চয়াং। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরিসংস্থিতাং॥ শিবা-ভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেনচ সমং বিপরীত রতাতুরাং॥ সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন সরোরুহাং। এবংসঞ্চি-ন্তয়েৎকালীং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধিদাং॥" ছিন্নমস্তার ধ্যান আরও ভয়ানক। বাস্তবিক কালীর মূর্ত্তি, অস্ত্র, অনুচরী, ডাকিনী ও যোগিনী, এবং আলয় ভূতশ্মশান, সকলই ভয়ানক ভাবের অব-তার বিশেষ। কালী সংক্রান্ত সকল বিষয়ই যেমন ভয়ানক, সেইরূপ আবার কৃষ্ণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই আনন্দপ্রদ। কৃষ্ণের মূর্ত্তি মনোহর, হস্তে আনন্দজনক শব্দকর মুরলী, প্রিয়তমা আনন্দরূপিনী রাধিকা, মনোহর বেশধারিণী সখীগণের মধ্যে কেহ বীণাহস্তা, কেহ বংশীহস্তা, কেহ রবাববাদনতৎপরা, কেহ মৃদঙ্গহস্তা, কেহবা খঞ্জরীবাদনতৎপরা। সংক্ষেপতঃ তাহারা নৃত্যগীত-পরায়ণা, সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদনে নিপুণা, এবং পীত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি আপন অঙ্গশোভাসংবর্দ্ধক পরিধেয় বস্ত্রে সুশোভিতা। কালীর মূর্ত্তি ও সংগ্রামরূপ কার্য্য উভয়ই ভয়ানক। কৃষ্ণের মূর্ত্তি ও নৃত্যগীতরূপ কার্য্য উভয়ই

মনোহর। কালীর উপাসকেরা যেমন সকল প্রকার ভয়ানক ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যারপর নাই যত্নপরায়ণ হইয়াছেন, সেইরূপ কৃষ্ণের উপাসকগণও, আনন্দজনক ভাব সংগ্রহে, যিনি যে স্থান হইতে পারিয়াছেন,তিনি সেই স্থান হইতেই উপকরণ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কালীর বাসস্থান ভয়ানক শ্মশান, কৃষ্ণের বাসস্থান মনোহর বৃন্দাবন। কালীর হস্তে ভয়ানক খড়্গ। কৃষ্ণের হস্তে মনোহর মুরলী। কালীর কলেবর রুধিরলিপ্ত। কৃষ্ণের শরীর চন্দনচর্চ্চিত। কালী ঘোররবা। কৃষ্ণ মিষ্টালাপী। কালী রণরঙ্গিনী। কৃষ্ণ নৃত্যগীতপরায়ণ। কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা। কৃষ্ণের কণ্ঠে কুসুমহার। সংক্ষেপতঃ কালীর ভয়ানক বেশ। কৃষ্ণের মূর্ত্তি মনোহর। কালীর উপাসক নানাপ্রকার প্রাণী বলিদান করে. কৃষ্ণের উপাসনায় বলি নিষিদ্ধ। কালীর পূজা-কাল অমাবস্যা তিথি এবং ঘোররূপা রাত্রি। মৃতদেহে উপবিষ্ট হইয়া, শ্মশানে তাঁহার সাধন সম্পন্ন করিতে হয়। পূজার বাদ্যযন্ত্র ঢক্কা, ও উপহার পুষ্প রুধিরবর্ণ জবা। তান্ত্রিকেরা, বাহ্যতঃ আবার পঞ্চ, মকার দ্বারা ভয়ানক সাধন-প্রণালীরও বিধান করিয়াছেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ও মৈথুন এই পঞ্চ মকারের প্রায় প্রত্যেকই বাহ্যতঃ, এক এক ভয়ানক সাধন-প্রণালী। বাহ্যতঃ, বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পঞ্চ মকারের আধ্যাত্মিক ভাব অত্যন্ত নির্ম্মল ও উচ্চ। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ বসু তাঁহার "হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম" নামক পুস্তকে পঞ্চ মকার সম্বন্ধে আগমসারের যে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ স্থানে মদ্য সামান্য মদ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারা অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ; মাংস

সামান্য মাংস নহে, কিন্তু জিহ্বা সংযম; মৎস্য সামান্য মৎস্য নহে, কিন্তু শ্বাস নিরোধ; মুদ্রা সামান্য মুদ্রা নহে, কিন্তু আত্মাতে পরমাত্মা মুদ্রিত আছেন এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান; মৈথুন সামান্য মৈথুন নহে, কিন্তু জীবাত্মাতে পরমাত্মার বিরাজ।

লক্ষ্মী।

শোভা ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম লক্ষ্মী। চন্দ্র অত্যন্ত শোভাময় এই জন্য চন্দ্রকে লক্ষ্মীর সহোদর বলা হইয়াছে। সম্পত্তি কাহারও নিকট স্থির থাকে না, সুতরাং লক্ষ্মী চঞ্চলা। পদ্মবন অত্যন্ত রমণীয় স্থল, সুতরাং লক্ষ্মীর নাম পদ্মালয়া। শোভা ইহতে কাম জন্মে, সুতরাং লক্ষ্মী কন্দর্পের জননী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

চতুর্ব্ব্যূহ।

মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধকে ব্রহ্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তার নানা প্রকার মনন করাই আবশ্যক হয়। বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম প্রদ্যুম্ন। চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম বাসুদেব। অহঙ্কার অর্থাৎ আমিত্ব বোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের নাম সঙ্কর্ষণ।

গণেশ।

সিদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরের নাম গণেশ। অগ্রে সিদ্ধি কামনা করিয়াই লোকে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং সর্ব্ব দেবতার পূর্ব্বেই গণেশের পূজা বিহিত হইয়াছে। মূষিক নানাপ্রকার বস্তু ছেদন করে, সুতরাং বিঘ্নচ্ছেদনকারির বাহন কল্পনা করিতে হইলে মূষিকই সুসঙ্গত হয়। বিঘ্নস্বরূপ অন্ধকারের নিকট জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া গণপতির সিন্দূর বর্ণ কল্পিত হইয়াছে। হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা জল উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত উদরসাৎ করে, কিম্বা ফুৎকার করিয়া বাহিরে ফেলায়, সেইরূপ গণেশ ইচ্ছামত বিঘ্নরাশি উপস্থাপন ও নিরাকরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে গজমুখ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সমস্ত সিদ্ধি তিনি আপনাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে লম্বোদর বলা হয়।

ষষ্ঠী।

শিশুপালন কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই অর্থে ঈশ্বরের নাম ষষ্ঠী। ঈশ্বর যেমন সম্পত্তি দান সময়ে লক্ষ্মী নামে অভিহিত হন, সেইরূপ শিশুপালন করণ কালে তাঁহার নাম ষষ্ঠী। ষষ্ঠী প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ জগতের প্রাণী সংখ্যার প্রায় ষষ্ঠাংশই শিশু। বিড়াল অত্যন্ত স্নেহ-আকর্ষক জন্তু, সুতরাং উহাই ষষ্ঠীদেবীর বাহন কল্পিত হইয়াছে। ষষ্ঠীকে কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রী বলা হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে কুমারেরা অর্থাৎ শিশুরা

অত্যন্ত মনোহর বলিয়া মনোহর কান্তি বিশিষ্ট কুমারের অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রীকেই তাহাদের পালন-কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিতে যুক্তিযুক্তরূপেই প্রবৃত্তি জন্মে।

দশাবতার।

আমার স্মরণ হইতেছে ভ্রমর নামক মাসিক পত্রে দশাবতারের পশ্চাল্লিখিত তাৎপর্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—প্রথমতঃ জগতে মৎস্যের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ভগবানের আদি অবতারের নাম মৎস্য। তৎপর কূর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় অবতারের নাম কূর্ম্ম। তৎপর ক্রমান্বয়ে বরাহ, সিংহ ও মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবতারের নাম যথাক্রমে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্চাবতারও মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, সুতরাং তাহাদের কথা আর পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পঞ্চবার মনুষ্যাবতার প্রদর্শনের তাৎপর্য্য কেবল পঞ্চবিধ অসাধারণ ঘটনা সম্পাদন মাত্র। আমাদিগের মতে অন্য প্রকারেও দশাবতারের তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সকল দেশীয় শাস্ত্রেই একটী অতীত প্রলয়ের বিবরণ বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে সেই সময়ে প্রায় সমুদয় পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বেদের বর্ত্তমান সত্তা প্রমাণ করিতেছে যে বেদ রক্ষা পাইয়াছিল, সুতরাং বেদের রক্ষককে এক অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; বেদ যে কোন প্রকারেই রক্ষা পাউক কিন্তু প্রলয়পয়োধি জলে কোন বস্তুর রক্ষক কল্পনা করিতে হইলে তাহাকে জল-

বিহারী মৎস্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট করা উচিত, সুতরা বেদরক্ষককে মৎস্যাবতার বলা হইয়াছে। পৃথিবীকে ধারণ করার নিমিত্ত কোন প্রাণী কল্পনা করিতে হইলে, কূর্ম্মকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যেহেতুক অন্য কোন প্রাণী নির্দ্দিষ্ট করিলে তাহার আবার পদস্থাপনের স্থান অন্বেষণ করিতে হয়, কিন্তু কূর্ম্মকে মনোনীত করিলে একভাবে আর পদস্থাপনের স্থান অন্বেষণ করিতে হয় না, যেহেতুক কূর্ম্ম আপনার পদ আপনার শরীর মধ্যেই লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে পারে। অতএব কূর্ম্মকে দ্বিতীয় অবতার বলা হইয়াছে। আর এক কথা, দিগ্বলয়রূপ শূন্যকে কূর্ম্মাকার দেখা যায়। পৃথিবীর নীচেও ঐ প্রকার কচ্ছপাকৃতি দিগ্বলয়রূপ শূন্য আছে বলিয়া "পৃথিবী শূন্যে আছে" এই কথাটী সূচিত করিবার নিমিত্ত ও পৃথিবী ধারক শূন্যকে কূর্ম্মাবতার বলা কবিদিগের পক্ষে যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবী প্রলয় কালে জলমগ্না হইয়াছিল, অতএব যদ্যপিও নৈসর্গিক কারণ দ্বারাই সেই জল অপসারিত হইয়াছে, তথাপি জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করার নিমিত্ত কোন আবতারিক আকার কল্পনা করিতে হইলে মৃত্তিকাতে স্বীয় দন্ত প্রোথিতকারী শূকরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়; অতএব জল হইতে পৃথিবী উদ্ধারক কল্পিত আকারকে বরাহাবতার বলা হইয়াছে। ভগবদ্বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করার নিমিত্ত ও উক্ত দৈত্যকে বিদীর্ণ করার নিমিত্ত নৃসিংহ মূর্ত্তি অতি উৎকৃষ্টরূপে কল্পিত হইয়াছে, যেহেতুক ঐ মূর্ত্তিতে মনুষ্য হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধরা ও সিংহমুখ দ্বারা নিদারুণ ভাবে বিদীর্ণ

করা উভয় কার্য্যেরই উপায় আছে। অসাধারণ ক্ষমতা শালী মহাত্মাদিগকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে ;—যথা বামন, ভৃগুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধদেব ও ভাবি-অত্যাচার-নিবারক কল্পিত কল্কী।

কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীগণ।

কৃষিভূর্ব্বাচকঃ শব্দোনশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ কৃষ ধাতুর অর্থ হওয়া ও ণ শব্দের অর্থ পরমানন্দ। সুতরাং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর। যশোদা-তনয় কৃষ্ণের অনেক পূর্ব্বেও কৃষ্ণ নাম বিদ্যমান ছিল। সত্য-যুগে প্রহ্লাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণ কোথায় আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, প্রহ্লাদ উত্তর করিয়াছিল যে তিনি সকল স্থানেই আছেন; সুতরাং কৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিয়া নন্দনন্দনের জন্মপূর্ব্বেও অবধারিত ছিলেন। এখনও লোকে যেমন পরমেশ্বরের নামে স্বপুত্র প্রভৃতির নাম নারায়ণাদি রাখেন; কৃষ্ণের নাম-করণ-সময়েও সেইরূপ ঈশ্বরের নামে তদীয় নাম রাখা হইয়াছিল, তবে এই মাত্র বিশেষ যে, তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে স্পষ্ট বর্ণনাই আছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রথমে নিত্যধাম গোলোকে বিরাজিত ছিলেন, পরে শ্রীদামের শাপে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুল ধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শূন্যের নাম অনন্তদেবও

বলরাম; এইক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে যে, শূন্যই কৃষ্ণের পীতাম্বর স্বরূপ;—যথা বাঙ্গালায় অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে "আমার বিচ্ছেদ ভাই নাহি সহে ক্ষণমাত্র। পীতাম্বর রূপে মোর বেড়ি রহে গাত্র॥" বাস্তবিক বিশ্বরূপ ঈশ্বরবিগ্রহ শূন্যরূপ বসন দ্বারাই আবৃত। মুরলীধ্বনির অর্থ বেদগান, যথা, পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে "শব্দরূপে কৃষ্ণমুখে মুরলীতে গান।" গোপী শব্দের অর্থ প্রকৃতি, সুতরাং রাধা প্রভৃতিকে গোপী বলা হইয়াছে।

শোভা নামে এক গোপী চন্দ্র প্রভৃতি সুন্দর বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ শোভা এক গোপী যথা——

দৃষ্টস্ত্বং শোভয়াগোপ্যা যুক্তশ্চন্দনকাননে।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজোবভূবহ॥
"কিঞ্চিৎ স্ত্রীণাং মুখাব্জেষু কিঞ্চিদব্জেচকিঞ্চন"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড।

স্বাহা অর্থাৎ অনলের দাহিকা শক্তিকে গোপী বলা হইয়াছে, যথা "স্বাহাচ সুন্দরীগোপী পুরাসীদ্রাধিকা সখী" ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড।

স্বধা অর্থাৎ পিতৃগণের (শাস্ত্রমতে পিতৃলোক নামে একটী লোক আছে) পত্নীকে এক গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা "পুরাসীত্ত্বং স্বধাগোপী গোলোকে রাধিকাসখী।" ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

শান্তি নামে এক গোপী মনুষ্যদিগের মনে এক সদ্গুণ স্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে অর্থাৎ মানসিক গুণ শান্তিকে এক গোপী বলা হইয়াছে; যথা "শান্ত্যাগোপ্যা যুতস্ত্বঞ্চ দৃষ্টোহংরাস-

মণ্ডলে। তত্তস্তস্যাঃশরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূবহ” ইত্যাদি ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

শ্রদ্ধা নাম্নী গোপী মনুষ্য মনে এক সদ্‌গুণস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে। ক্ষমা নামে এক গোপী মনুষ্য মনে প্রবিষ্ট হইয়া এক সদ্‌গুণের স্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ মানসিক গুণ ক্ষমা গোপীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা “ময়াপূর্ব্বঞ্চত্বংদৃষ্টো গোপ্যাচ ক্ষময়াসহ। ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠংবভূবহ।” ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড। ঈশ্বরের সাগর-প্রসবিনী শক্তিকে বিরজা আখ্যা দিয়া এক গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা “গোপিকা বিরজা মন্যা ইত্যাদি” বিরজা সারজোযুক্তা ধৃত্বা বীর্য্যামেয়োজকং। সদ্যোবভূবতত্রৈব ধন্যা গর্ভবতীসতী॥ “ততঃ সুধাব তত্রৈব পুত্রান্ সপ্ত মনোহরান্” ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড। মায়াময় লোক ও মায়াতীত লোকের মধ্যস্থ সীমাকেও বিরজা (রজোগুণ বিবর্জ্জিতা) বলে।

শ্রুতিগণকে গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা “গো-প্যস্তশ্রুতয়োজ্ঞেয়া” ইত্যাদি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড হইতে উদ্ধৃত শব্দকল্পদ্রুমের শ্লোকাংশ।

ঈশ্বরের সেবাশক্তির অধিষ্ঠান পাত্র বলিয়া মুনিগণকেও গোপী বলা হইয়াছে।

দেবকন্যা অর্থাৎ স্বর্গীয় পদার্থ-কতিপয়কেও গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যকথঞ্চন।” ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের শ্লোকাংশ।

যজ্ঞাদির নিমিত্ত দক্ষিণাকে এক গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে "যা সুশীলাভিধাগোপী পুরাসীদ্রাধিকাসখী। উবাস দক্ষিণে ক্রোড়ে কৃষ্ণস্যরাধিকাগ্রতঃ। প্রধ্বস্তা সা চতৎশাপাদ্গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা। কৃষ্ণালিঙ্গনপুণ্যেন সবভূবচ দক্ষিণা।" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

প্রভা এক গোপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা "দৃষ্টস্বং প্রভয়াগোপ্যা যুক্তোবৃন্দাবনে বনে। সদ্যোমচ্ছদ্মমাত্রেণ তিরোধানংকৃতংত্বয়া॥ প্রভাদেহংপরিত্যজ্য জগামসূর্য্যমণ্ডলং। ততস্তস্যাঃশরীরঞ্চ তীব্রতেজোবভূবহ॥" ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রীকে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীকে, তুলসী বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুলসীকে, যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে এবং সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মীকে ক্রমান্বয়ে পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, বিশাখা এবং চন্দ্রাবলী নামধেয়া গোপীগণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তিকে রাধিকা বলা হইয়াছে।

অন্যান্য গোপীদিগকে রাধিকার অংশ ও গোপদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, "বভূব গোপীসংঘশ্চ রাধায়াল্লোমকূপতঃ। শ্রীকৃষ্ণলোমকূপেশ্চ বভূবসর্ব্ববল্লবাঃ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড।

যেমন মুনি, দেবী ও শ্রুতি প্রভৃতিকে গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইরূপ নিত্যধাম গোলোকাংশ বৃন্দাবনকেও পৃথিবীতে বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। যথা "একদারাধিকেশশ্চ

গোলোকেরাসমণ্ডলে। শতশৃঙ্গপর্ব্বতৈকদেশে বৃন্দাবনে বনে ॥”
ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড।

বৃন্দাবনে ঈশ্বরের কেবল আনন্দময়ত্ব অর্থাৎ মাধুর্য্যের বিলাসই বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বর আনন্দময় এই বিষয়কে রূপকের দ্বারা বর্ণনা করিতে গিয়া আনন্দের উপকরণ স্বরূপ যত বিষয় অনুভব গোচর হয়, কৃষ্ণলীলাতে তত্তাবৎ বিষয়েরই অবতারণা করা হইয়াছে। উক্ত লীলাতে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃষ্ণের নানারূপ লীলাকে অত্যন্ত দূষিত দেখা যায়, এই জন্য উহার বর্ণনাকারী কবিগণ ভগবানের সর্ব্বান্তর্যামিত্ব নিবন্ধন তাঁহাতে পরদারাভিগমনরূপ দোষ আদৌ বর্ত্তিতেই পারে না, এই বলিয়া সেই দোষের নিরাকরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক উক্ত লীলার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম দোষাবহ নহে, তবে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এ লীলার পুনঃ পুনঃ আলোচনা অবশ্যই অত্যন্ত অনিষ্টকর হইতে পারে। উহার আধ্যাত্মিক ভাবে দোষ সংস্পর্শই হইতে পারে না বটে কিন্তু বাহ্যিক ভাব অনেক স্থলে দোষাবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিগণ সেই বাহ্যিক দোষের নিরাকরণ জন্য ভগবানের অন্তরাত্মত্ব উল্লেখ ব্যতিরেকে ও অন্যান্য অনেক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মা রীতিমত রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে মানুষিক ভাবে দাম্পত্য-প্রেমোপভোগের সম্পূর্ণ ন্যায্য অধিকার দিয়াছেন। আর আয়ান যে রাধিকাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেবল তাহার তপস্যার জন্য, এবং তাহার তপস্যার পূর্ব্বে রাধিকা কৃষ্ণেরই অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। অতএব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের যে বিবাহ-ব্যাপার

সম্পন্ন হয় তাহা এবং রাধা যে পূর্ব্বে কৃষ্ণেরই পত্নী ছিলেন, ইহা এই উভয়ের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়গত ব্যভিচার দোষের নিরাকরণ হইয়াছে। অন্যান্য গোপী সম্বন্ধে তাঁহারা ভগবানের অন্তরাত্মাত্ব প্রদর্শন করিয়া ব্যভিচার-মহাপাপের অস্তিত্বই যে ঘটে নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রামসীতার বিশুদ্ধ প্রেমের ন্যায় যে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলাও প্রদর্শিত হয় নাই ইহার একটী বিশেষ কারণ আছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনকারী কবিদিগের মাধুর্য্য ও আনন্দ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য ছিল, আনন্দের যে যে উপকরণের কল্পনা করা যাইতে পারে, তাঁহারা তৎসমুদয়েরই সম্মিলন সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, বৈধ প্রণয় অপেক্ষা ব্যভিচারেই অধিকতর প্রলোভন আছে, সুতরাং উহা অধিকতর আনন্দপ্রদ বলিয়া লোকের নিকট প্রতীয়মান হয়। উহাতে যদি অধিক আনন্দের লোভনা থাকিত তবে সহস্র সহস্র লোক কেন এই ভয়ানক মহাপাপে প্রাণহরণ আশঙ্কও তুচ্ছ করিয়া লিপ্ত হইবে? ধর্ম্মপরায়ণ কবিগণও আনন্দভাব প্রদর্শনের লোভে ব্যভিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক বটে, কিন্তু উহা করিতে তাঁহারা যে অস্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণলীলার পুনঃ পুনঃ আলোচনা অত্যন্ত বিপদজনক। উহা অমৃতময় এবং গরলময়ও বটে। অমৃতাংশ উদ্ধার করিয়া লইলে সকলেই উহা উপভোগ করিতে পারে।

আবার দেহরূপ ধামের সহিত বাহ্যিক স্থানরূপ ধামেরও সমন্বয় করা হইয়াছে। যথা—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং ॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

বাঙ্গলাতে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানে নন্দকুমার কবিরত্ন বলেন "শিরঃসহস্রার পদ্মকে গোকুলাখ্য মহৎ পদ অর্থাৎ পরমব্রহ্মপদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততং ॥"

এই গোকুলাখ্য বিষ্ণুর পরমপদ, ইহাকে চক্ষুর নিরোধভাব প্রযুক্ত বিস্তৃত বিয়ৎ সদৃশ সুসাধক জ্ঞানীগণেরা জ্ঞান-দৃষ্টিতে নিয়ত অবলোকন করিতেছেন। "পরমাত্মার প্রভাসম্ভব শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপ, একারণ অনন্তাংশ সম্ভব বলিয়া শ্লোক উক্ত করেন। গোশব্দে "ইন্দ্রিয়" কুল শব্দে "সমূহ" অতএব সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের আশ্রয়ভূত স্থান, এ প্রযুক্ত তাহাকে গোকুল বলেন। যেমন শিরঃস্থিত সহস্র পত্র পদ্ম, সেইরূপ বাহিরে সহস্র পত্রাকার বনোপবন বিশিষ্ট গোকুলধাম, তাহাতে যেমন প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমাত্মার অধিষ্ঠান, এখানেও সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যাবস্থান। তাহাতে যেমন দ্বাদশ দল পদ্মে গুরুরূপী পরমাত্মার বাস, এখানেও সেইরূপ দ্বাদশ সংখ্যক মহাবনে গোবিন্দের বাস। তথায় যেমন অষ্টদল ব্রহ্মাসন, এখানেও সেইরূপ কর্ণিকার রূপ অষ্ট কোণ সমন্বিত মহাপীঠ রাসমণ্ডল। সেই শিরঃ সহস্রার অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় বৃত্তির সহিত অবস্থিতি করে, এখানেও সেইরূপ নন্দাদি গোপ সকল

গোপীগণের সহিত গোকুলধামকে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন ইত্যাদি।”

অথতেপেসসুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ং।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকেশং পরাৎপরং॥
প্রকৃত্যাগুণরূপিণ্যারূপিণ্যাপর্য্যুপাসিতং।
সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে॥
ভূবিচিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনং॥
শব্দব্রহ্মময়ংবেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং তৈঃ স্বৈবংশৈরভিষ্টুতং॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানে উক্ত কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন “সকামসাধকব্রহ্মা স্বীয় ভাবনাবিশেষানুসারে অর্থাৎ স্থষ্টিকৃৎশক্তি বিশিষ্ট হইবার ইচ্ছায় বক্ষ্যমাণ স্তবে গোকুলাখ্য মহাপীঠগত ভগবান গোবিন্দের উপাসনা করিয়াছিলেন।

এই গোবিন্দাদি বিশেষণে পরমাত্মাই এক বিশিষ্য হন, অর্থাৎ গোবিন্দ শব্দে পরমাত্মা, সেইরূপ কৃষ্ণশব্দও পরমাত্মার বিশেষণগত হয়। শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্মস্বরূপ গোকুলাখ্য ধামকে মহৎপদ বলিয়া বর্ণনা করেন; “সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদ মিতি পদ্মপুরাণং” শুক্লবর্ণত্ব হেতু তৎ পদ্মকে শ্বেতদ্বীপাখ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চিন্তামণিপীঠ পদে, সকলের চিন্তনীয় স্থান, তন্মধ্যে মহাসন দ্বাদশদল পদ্ম আত্মার আসন, জ্যোতিরূপ পদে তেজোময় আত্মা, নিত্য বিলাসিনী শক্তি গোপীগণে আবৃত, ইত্যর্থে ইন্দ্রিয়শব্দে গোপ তত্ত্ব

বৃত্তিকে বিলাসিনী গোপী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি রাধা তৎপরিচারিকা ললিতাদি গোপী শান্তি দয়াদি-রূপে বিখ্যাতা এবং বহিরঙ্গা অসদ্বৃত্তিরূপা চন্দ্রাবল্যাদি গোপী সকল তদ্দর্শন পথের আবরিকা, বৃত্ত স্বাংশপদে তদংশ গোপগণ, আত্মারূপের অংশ ইন্দ্রিয়গণ তৎ কর্ত্তৃক আত্মা পরিষ্টুত হন ইত্যাদি। আত্মার অধর লগ্নপ্রায় নাদ ব্রহ্মপ্রণব, এখানেও শ্রীকৃষ্ণ বদনকমলে প্রণব স্বরূপ শব্দময় বেণু সংলগ্ন হয়। নিত্য বিলাসিনী নির্গুণা রাধা। সকাম বিলাসিনী সগুণা চন্দ্রাবলী সত্ত্ব রজঃ তমো গুণময়ী মায়া যবনিকার ন্যায় আত্মার দর্শন-পথের আবরিকা হন ইত্যাদি।”

যাহা হউক, রাধিকা ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা পরমেশ্বর আনন্দ অনুভব করেন ও জীবদিগকে আনন্দ অনুভব করান তাহারই নাম হ্লাদিনী শক্তি। দুর্গা শক্তিস্বরূপা এবং রাধা আনন্দস্বরূপা। দুর্গা বলরূপিণী, রাধা আনন্দ-রূপিণী। গত বৎসর পূজার সময়ে হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে দুর্গার যে ব্যাখ্যান প্রকাশিত হয় তাহাতে লেখক রাধাকে প্রীতি-স্বরূপা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। আমরা রাধাকে আনন্দস্বরূপা বলিলাম। এখন এই আনন্দের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কোথায় উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক। আনন্দ অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সকল আনন্দেরই মূলে প্রীতি রহিয়াছে। আমরা যে বস্তুর প্রতি প্রীতি করি তল্লাভ দ্বারাই আনন্দ প্রাপ্ত হই। অতএব প্রীতিই আনন্দস্বরূপা। মানুষিক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, স্ত্রীতেই প্রীতি অধিক, তাহাতেই

তাঁহার প্রিয়তমের প্রতি মানও অধিক। এই জন্যই পদে পদে রাধিকাকে মানিনী রাধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর ক্ষয় ও বৃদ্ধি রহিত, সুতরাং সর্ব্বদাই এক ভাবাপন্ন। ক্ষয় রহিত বলিয়া এ স্থলে তাঁহার বৃদ্ধ মুর্ত্তি ধ্যান বিহিত হয় নাই। শাস্ত্রে ইহার প্রসঙ্গ আছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বৃন্দাবন বর্ণন ছলে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ভাবেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত স্থলে কেবল আনন্দের ছবি সকলই একত্রিত করা হইয়াছে। উহাতে রূপক দ্বারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রায় বর্ণনাই করা হয় নাই। দ্বারকালীলা বর্ণন ছলে আবার ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবেরই বিস্তারিত বর্ণন দেখা যায়। দ্বারকানাথের দর্শনার্থে এক সময়ে কোটী কোটী ব্রহ্মা অসিয়া দ্বারকা নগরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান্ ছিলেন; কাহারও চারি মুখ, কাহারও দশ মুখ, কাহারও শত মুখ এবং আর কতকগুলিন ব্রহ্মার ক্রমান্বয়ে সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত ও কোটী মুখ ছিল। এই বর্ণনার তাৎপর্য্য কেবল ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের প্রকাশ মাত্র। এস্থলে একটী কথা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দ্বারকা ও বৃন্দাবন লীলা কি এককালীন কবি-কল্পনা? ইহাতে কি বাস্তবিক ঘটনার লেশ মাত্রও নাই? এতদুত্তরে বক্তব্য যে, ঐ দুই লীলাতে যাহা যাহা অতিমানুষিক ও অতিনৈসর্গিক তৎসমুদয় কল্পনা মাত্রই বটে। তত্তৎস্থলে রৌপকিক ভাবে ঈশ্বরের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই স্থলে যাহা যাহা মানুষিক ও নৈসর্গিক তৎসমুদয় প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই অনুমিত হয়। এস্থলে আরও

এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনুষ্যদেহধারী কৃষ্ণেতে কেন ঈশ্বরত্ব আরোপিত হইয়াছে? ইহার উত্তর অতি সহজ। যখন প্রস্তর খণ্ডরূপ শালগ্রাম শিলাতেই ঈশ্বর-বুদ্ধি করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন অসাধারণ প্রভাব বিশিষ্ট কোন মহাপুরুষেতে যে ঈশ্বরবুদ্ধি করার উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যেমন সারসের আলাপ ও হাড়গিলার বক্তৃতা ছলে বালকদিগকে নীতি শিখান হয়, সেইরূপ অজ্ঞ মনুষ্যদিগকে মানুষিক প্রভৃতি আকার অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম শিখান হইয়াছে, শাস্ত্রে একথা অতি স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বারকা ও বৃন্দাবন নামধেয় স্থানদ্বয় যখন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ঐ স্থানদ্বয় কৃষ্ণ-নামধারী মনুষ্যকুলতিলক কোন মহাপুরুষের যে অভিনয়ভূমি ছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বোধ হয় কবিগণ নানা কল্পনা করিয়া সেই মহাপুরুষের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের মতে যে কৃষ্ণের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ।

এস্থলে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ উচিত বোধ হইতেছে; বিষয়টী এই। আমরা ইতিহাস দ্বারা পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি যে, অসৎ বিষয়ের সহিত সৎ বিষয়ের সমাবেশ করিলে পরিণামে অসৎ পক্ষই প্রবল হইয়া উঠে। তান্ত্রিকতা আধ্যাত্মিক ভাবে পবিত্র, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে জঘন্য। কে না স্বীকার করিবেন যে, ঐ দুই বিপরীত ভাবের সমাবেশ হইতে অতি জঘন্য কুৎসিত ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। মনুষ্যকুলতিলক চৈতন্যদেব ঐ কুফল অপসারিত করার সময়ে অজ্ঞাত-

সারে আবার এক নূতন কুফল প্রসবকারী বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। উহা বর্ত্তমান কালে সেই কুফল প্রকাশ করিয়া প্রকৃত সাধুদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। এই দলের অনল্প লোক দ্বারা রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কত কদর্য্য ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই পশুদিগের দ্বারা ধর্ম্মের ভানে কি ভয়ানক পাপই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে চৈতন্যমতাবলম্বী প্রকৃত সাধুদল মধ্যে এমন কেহ কেহও আছেন, যাঁহারা ঋষিতুল্যব্যক্তি এবং জগতের নমস্য। ধর্ম্মমতে সময়ে সময়ে সাধুভাবের সহিত যে অসাধু ভাবের মিশ্রণ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কেবল লোকের মনোরঞ্জন এবং আকর্ষণের জন্য, কিন্তু এই আকর্ষণ দ্বারা পরিণামে অনেক লোক সুগভীর কলুষ পঙ্কেই পাতিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী, গঙ্গা ও লক্ষ্মী, ইহাঁরা পূর্ব্বে গোলোকধামে বিরাজিত ছিলেন, শাপক্রমে অংশরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে পার্থিব পরমাণু সমষ্টি, জলীয় পরমাণু সমষ্টি এবং রজত কাঞ্চনাদির পরমাণু সমষ্টি এ সমুদয়ই অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্মে সূক্ষ্মকারণ ভাবে অবস্থিত ছিল, পরে সৃষ্টিকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া স্থূল স্থূল আকার ধারণ করিয়াছে। নিত্যলোক গোলোক বা ব্রহ্মলোকের সহিত নশ্বর পৃথিব্যাদির সম্বন্ধ আছে, এই জন্য স্থূল পৃথিব্যাদিকে নিত্যা-প্রকৃতির অংশ স্বরূপ বলা হইয়াছে। জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও যে লোকে বা যে অবস্থাতে প্রত্যক্ষভাবে জীবের সহিত আধ্যাত্মিক কথোপকথন করেন, যে অবস্থাতে বা লোকে

তাঁহার সত্তার প্রতি ক্ষণমাত্রও জীবাত্মার সন্দেহ জন্মিতে পারে না, এবং রোগ শোক দুঃখ জরা ব্যাধি আধি পাপ কিছুই আর জীবকে অভিভূত করিতে পারে না, যে অবস্থাতে বা লোকে যোগানন্দ প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের উৎস নিয়তই উৎসারিত রহে, যেখানে ক্রন্দন নাই, বিলাপ নাই, কেবল অবিচ্ছেদে আনন্দেরই বিলাস সংক্ষেপতঃ যাহা পূর্ণ ও নিত্যানন্দময়, তাহারই নাম ব্রহ্মলোক বা গোলোক। এই গোলোকেই নিত্যা ও অনিত্যা প্রকৃতি সৃষ্টির প্রাক্‌কালে সম্মিলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল. সৃষ্টি হইলে অনিত্যা প্রকৃতি নশ্বর জগৎ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কালে আবার পরব্রহ্মের সহিত নিত্যধামে গঙ্গা পৃথিব্যাদির পুনর্ম্মিলন হইবে। ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে প্রলয়কালে আবার সমস্ত সংসারই ব্রহ্মেতে যাইয়া প্রবিষ্ট হইবে।

কৃষ্ণকে অত্যন্ত কামুক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কাম-প্রবৃত্তি হইতেই প্রাণী-গণ জন্মলাভ করে, সেইরূপ জগতের সমস্ত বস্তুই সেই ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে প্রকাশিত বা সৃষ্ট হয়। এই ইচ্ছাকেই রূপকে সৃষ্টিকারিত্ব নিবন্ধন কাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে ঈশ্বর শস্য জন্মাইলেন, এই সহজ কথাটী পৌরা-ণিক কবির ভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, "শ্রীকৃষ্ণ অনুপম লাবণ্যবতী ধরণীকে দর্শন করিয়া জাতকাম হওতঃ ধরণীসুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন; তাহাতে তাঁহার গর্ভ হইতে কালে নানাবিধ শস্যরূপ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।" ইংলণ্ডীয় সুবিখ্যাত কবি কোলরিজ্‌ কবিজনোচিতভাবে প্রজো-

দিত হইয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, সূর্য্যের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে শস্য প্রাণী আদি অনেক পদার্থ জন্মলাভ করিয়াছে।

রূপগোস্বামী তৎ প্রণীত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে রাধিকাকে মহাভাব স্বরূপা বা পরম প্রীতি স্বরূপা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরপি বরীয়সী।" রাধাকে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিও বলা হইয়াছে। যাহা হউক এতৎ পূর্ব্বে প্রীতি দ্বারাই যে হ্লাদন কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং প্রীতি ও হ্লাদিনী শক্তি মূলে এক, এ বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। ঈশ্বরের চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ও রাধা নামে ব্যক্তিদ্বয় বলিয়া রূপকিক ভাবে বর্ণিত হইলেও উভয়েতেই আনন্দ স্বরূপই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান ও আনন্দেরই মূলাধার বটে। প্রীতি ও জ্ঞান উভয়েই আনন্দ উৎপাদন করে। কৃষ্ণের রূপও আনন্দময়, রাধিকার রূপও আনন্দময়। শোভাময়ী প্রকৃতিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শ্যামবর্ণ দ্বারা কৃষ্ণশরীর ও গৌরবর্ণ দ্বারা রাধিকাশরীর কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিলে শ্যামাদি বর্ণযুক্ত অর্দ্ধপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভাবে ঈশ্বর বুঝায়। আর রাধা বলিলে গৌরাদি বর্ণযুক্ত অর্দ্ধপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভাবে ঈশ্বর বুঝায়। বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর স্বরূপ। কৃষ্ণ বলিলে অর্দ্ধশরীরকেই এক শরীর জ্ঞান করিয়া তাহা ও তদন্তর্গত আত্মা বুঝায়, এবং রাধা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধশরীরকেই এক শরীর জ্ঞান করিয়া তাহাও তদন্তর্গত আত্মা বুঝায়, বৈষ্ণবেরা প্রায় উভয় শরীরকেই কল্পিত নরাকারে ধ্যান করিয়া থাকেন, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ একত্র বলিলে বিশ্বাত্মা

অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম বুঝায়। তখন বিশ্ব এক পরমেশ্বরের পূর্ণ শরীর বলিয়া প্রকাশ পায়। যাহা হউক উভয়েরই মূর্ত্তি আনন্দদায়িনী, এবং বৈষ্ণব কবিগণ তাহার বিস্তর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে কৃষ্ণের একটী রূপ বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

"নবীন নীরদশ্যামং কিশোর বয়সং শিশুং।
শরন্মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডপ্রভা মোচনলোচনং॥
শরৎপার্ব্বণ পূর্ণেন্দু শোভাচ্ছাদন মাননং।
কোটী কন্দর্পলাবণ্যলীলা নিন্দিত সুন্দরং॥
কোটীচন্দ্রপ্রভাযুষ্ট পুষ্ট শ্রীযুক্ত বিগ্রহং।
সস্মিতং মুরলীহস্তং সুপ্রশস্তং সুমঙ্গলং॥
বহ্নিসংস্কারপীতাংশুযুগলেন সমুজ্জ্বলং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতং॥
আজানুমালতীমালা বনমালা বিভূষিতং।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্তং মণি মাণিক্য ভূষিতং॥
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলং।
রত্ন কেয়ূরবলয় রত্ন মঞ্জীররঞ্জিতং॥
রত্ন কুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থল সুশোভিতং।
মুক্তাপংক্তিবিনিন্দৈব দশনং সুমনোহরং॥" ইত্যাদি।

রাধিকারও একটী রূপবর্ণনা দেওয়া গেল।—

"দেবী ষোড়শবর্ষীয়া নবযৌবনসংযুতা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা॥
সুকোমলাঙ্গী ললিতা সুন্দরীযুচ সুন্দরী।
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তা পীনশ্রোণী পয়োধরা॥
বন্ধুজীব জিতারক্ত সুন্দরৌষ্ঠাধরা বরা।

মুক্তাপংক্তি জিতাচারু দন্তপংক্তির্ম্মনোহরা ॥
শরৎ পার্ব্বণ কোটীন্দু শোভাযুষ্টশুভাননা।
চারুসীমন্তিনী চারু শরৎ পঙ্কজলোচনা ॥
খগেন্দ্রচঞ্চুবিজিত চারুনাসা মনোহরা।
স্বর্ণগেণ্ডুক বিজিতে গণ্ডযুগ্মেচ বিভ্রতী ॥
দধতী চারুকর্ণেচ রত্নাভরণ ভূষিতে।
চন্দনাগুরুকস্তূরীযুক্ত কুঙ্কুম বিন্দুভিঃ ॥
সিন্দূর বিন্দুসংযুক্ত সুকপোলা মনোহরা।
সুসংস্কৃতং কেশপাশং মালতীমাল্যভূষিতং ॥
সুগন্ধকবরীভারং সুন্দরং দধতী সতী।
স্থলপদ্মপ্রভাযুষ্টং পাদযুগ্মঞ্চ বিভ্রতী ॥
গমনং কুর্ব্বতী সাচ হংস খঞ্জনগঞ্জনং।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণাং বনমালাং মনোহরাং ॥
হারং হীরক নির্ম্মাণং রত্নকেয়ুর কঙ্কণং।
সদ্রত্নসার নির্ম্মাণং পাশকং সুমনোহরং ॥
অমূল্য রত্ননির্ম্মাণং কণন্মঞ্জীররঞ্জিতং।
নানা প্রকার চিত্রাঢ্যং সুন্দরং পরিবিভ্রতী।"

ভাষাতেও রাধা ও কৃষ্ণের রূপবর্ণনা দেওয়া গেল।

কৃষ্ণের রূপবর্ণন।—

"মুখমণ্ডলজিতি, শরদসুধাকর, তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়াচারু, শিখণ্ডকমণ্ডিত, মালতী মধুকর মাল ॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবনমনোমোহন, মধুর মুরলী করু গান ॥
টলমল অলক, তিলক ঝল ঝলকই, ভাঙ্গ কি ধনুয়া ধুনান।

কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুম শর বাণ ॥
বান্ধুলি বন্ধু, অধরে মধু মাখল, মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ, মদন মদ মন্থর, ভণ তাঁহি গোবিন্দ দাস ॥”
“কিরূপ দেখিনু, মধুর মূরতি, পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এতিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার ॥
বড় বিনোদিয়া, চূড়ার টালনী, কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর, রসে চর চর, বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভুষণ, রজত কাঞ্চন, মণিমুকুতার মালা ॥
জোড় ভুরু যেন, কামের কামান, কেবা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম বাণ ॥
সুন্দর অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে, ওরূপ নাগর, দেখিলে পরাণ রয় ॥”

রাধিকার রূপ বর্ণন।—

“চম্পক কনক, কেশর কুসুমাবলী,
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন, জলদ নীলমণি,
ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে ॥
অমল ইন্দীবর, দল লোচন যুগ,
কত শত শশী জিনি কমল বয়ানী।
সিন্দূর বিন্দু, অরুণ ছবি নিন্দই,
অহি রমণী ফণী বেণী বনি ॥
বিভ্রম অধরে, মধুর মৃদ হাসনি,
দশন সুদামিনী দমন করে।

ভাঁর হার মণি, কুণ্ডল লম্বিত,
কত মণি দরপই দরপ বরে॥
চৌদিকে সহচরী, যন্ত্র বাজাওত,
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাঝে।
বল্লভ ভণত, প্রবেশলি নিধুবনে,
হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে॥"

"শরদ সুধাকর, বদন মণ্ডল, খণ্ডন বদন বিকাশ।
অধরে মিলায়ত, শ্যাম মনোহর, চিত চোরায়লি হাস॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু, যুত শত সেবিত, লাবণি বরণি না যাই॥
কবরী বকুল ফুলে, আকুল অলিকুল, মধুপিবি পিবি উতরোল
সকল অলঙ্কৃতি, কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি, কিঙ্কিণী রণ রণি বোল॥
পদ পঙ্কজ পর, মণিময় নূপুর, পূরিত খঞ্জন ভাষ।
মদন মুকুর জনু, নখমণি দরপণ, নিছনি গোবিন্দ দাস॥"

কৃষ্ণ রাধা ও গোপ্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রবিজ্ঞ বাবু কেদারনাথ দত্ত তৎপ্রণীত "কৃষ্ণ সংহিতায়" অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচকগণের তাহা পাঠ করিয়া দেখা উচিত। তাঁহার সঙ্গে আমার সকল বিষয়ে ঐক্য না থাকিলেও যে যে স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে তাহার আরও আলোচনা হয় ইহাই আমার কামনা। আমার কথা থাকুক আর না থাকুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না সত্য নির্ণয় হইলেই হইল।

আরও কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সৎ বিষয়ের সহিত অসৎ বিষয়ের মিশ্রণ ঘটিলে পরিণামে অসৎ পক্ষই প্রবল

হইয়া উঠে। এখন তাহার আরও দুইএকটী উদাহরণ দিয়া অন্য একটী কথার প্রসঙ্গ করিব। বৈষ্ণব ধর্ম্মে একটী বিধি আছে যে, বিগ্রহ সেবার্থে চুরি করাতে ক্ষতি নাই। এ স্থলে এই অভিপ্রায়ে ভক্তির সহিত চৌর্য্যের সম্মিলন করা হইয়াছে যে, চোরের মনে কালে ভক্তিভাব প্রবল হইলে চুরি করার ইচ্ছা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঐ উপায়ে তাহার মনে চুরি করার বাসনা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠে। গঞ্জিকা সেবন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত ধ্যান-নিমগ্ন থাকা যাইতে পারে, এই হেতু উহার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ করা হইয়াছে, কিন্তু কালে গঞ্জিকা-সেবী লোক ভয়ানক গাঁজাখোরই হইয়া উঠে।

কেহ যদি মনে করেন যে শাস্ত্রমতে উপাস্য দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিতে হইবে না। অতএব কৃষ্ণকে উপাসনা করার বিধি প্রবল থাকিলে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেও বিপদাশঙ্কা হইবে না। তবে বক্তব্য এই যে, এটী ভ্রম। যাঁহার কথা ও কার্য্য সর্ব্বদা আলোচনা করা যায়, আলোচকের অনুচিকীর্ষা না থাকিলেও অলক্ষিত ভাবে তদীয় চিত্তে আলোচ্য চরিত্র ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এবং কালে তাহাকে অনেক পরিমাণে আপনার অনুরূপ করিয়া ফেলে। কেবল কৃষ্ণরাধা চরিত্র সতীত্বেরই শিক্ষা দেয় (যেহেতুক কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছেন) কিন্তু স্বচ্ছন্দভাবে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত যে বিহারাদি বর্ণন আছে, তাহাই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের কারণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা যে

ভদ্র-বৈষ্ণবের গৃহে অনিষ্টোৎপাদন করিতে পারে নাই তাহার আর একটী কারণ আছে। বৈষ্ণব মতানুযায়ী ভদ্র-পরিবারেরা স্মার্ত্ত নিয়ম দ্বারাও বাধিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে তাঁহারা দুই নৌকায় পা দিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। জাতি-বৈরাগীদিগের দুরবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণ হইবে।

প্রবল প্রলোভনকে আহ্বান করিয়া আনা একটী ভয়ানক অনিষ্টের কারণ। তান্ত্রিক মতে উলঙ্গ স্ত্রী দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিতে যে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য মনের দৃঢ়তা সম্পাদন ও কাম-জয় এবং হৃদয় বলের পরীক্ষা করণ। ইহা দ্বারা যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছিল তাহা তান্ত্রিকতার ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। মনের বল পরীক্ষার্থে পরস্ত্রী ও পরপুরুষের নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করার প্রথা প্রবল হইলে নিশ্চয়ই ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিবে। ঐ প্রথা প্রবর্ত্তন জন্য অনেক সভ্যদেশে পাপ-প্রবাহ অতি খরতর ভাবে বহিয়া যাইতেছে।

দৈবাৎ প্রবল প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইলে, কোন চরিত্রের অগত্যা পরীক্ষা হইয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনা হইতে প্রবল প্রলোভন আনিয়া চরিত্রের পরীক্ষা করা অত্যন্ত বিপদজনক, সুতরাং অপরিণামদর্শিতার কার্য্য। পরস্ত্রী ও পরপুরুষের যতই ঘনিষ্ট ভাবে সংমিশ্রণ হইবে ততই নৈতিক বিপদ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইবে। ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আভাস্বর।

আত্মা, জ্ঞাতা, দম, দান্ত, শান্তি, জ্ঞান, শম, তপঃ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মোহ এই দ্বাদশটিকে আভাস্বর বলে। অর্থাৎ এই দ্বাদশটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে ঈশ্বরকে আভাস্বর নামে গণদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়। আত্মা একটি আভাস্বর, ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থে বা পরমাত্মা অর্থে ঈশ্বরেরই ঐ নাম স্থির হইয়াছে। আভাস্বর সম্বন্ধে একটী শ্লোকও আছে। যথা—"আত্মাজ্ঞাতাদমো-দান্তঃ শান্তির্জ্ঞানংশমস্তপঃ। কামঃ ক্রোধো মদো মোহো দ্বাদশাভাস্বরাইমে॥" ইতি বাচস্পত্যাভিধানধৃত পুরাণ বচন। মতান্তরে আভাস্বরের সংখ্যা ৬৪। কাম প্রবৃত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম কামদেব। উক্ত প্রবৃত্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য জন্মে, সুতরাং কামদেব মকরধ্বজ। মীনের চঞ্চলতা প্রসিদ্ধই আছে। মোহন, শোষণ, সন্তাপন, সন্দীপন ও স্তম্ভন এই পঞ্চ কার্য্যের জন্য কাম পঞ্চবাণ ও মনোহরত্ব জন্য পুষ্পধনু।

সাধ্যদেব।

নানা প্রকার যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-দিগকে সাধ্যদেব বলে। অর্থাৎ ঈশ্বরকেই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা ধরিয়া সাধ্যদেবগণ নাম দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বদেব।

নানা প্রকার শ্রাদ্ধের বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-দিগকে বিশ্বদেব বলে। যথা, "বিশ্বদেবৌক্রতুর্দক্ষৌ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু বিশ্রুতৌ। নিত্যং নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসুসত্যৌচ পৈতৃকে॥ নবান্না লম্ভনে দেবৌ কাম কালৌ সদৈবহি। অপি কন্যাগতে সূর্য্যে শ্রাদ্ধেচ ধ্বনিরোচকৌ॥ পুরুরবাশ্চাদ্রবাশ্চ বিশ্বদেবৌচ পর্ব্বণি।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত বহ্নিপুরাণ বচন। অর্থাৎ ক্রতু ও দক্ষ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে ও সকল যজ্ঞে, বসু ও সত্য পৈতৃক শ্রাদ্ধে, কাম ও কাল নবান্নালম্ভমে, ধ্বনি ও রোচক কন্যাগত সূর্য্য সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শ্রাদ্ধে, পুরুরবা ও অদ্রবা পর্ব্ব সময়ের শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন। বহ্নিপুরাণ মতে বিশ্বদেবের সংখ্যা দশ। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রাদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপে ঈশ্বরকেই ঐ ভিন্ন ভিন্ন দশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শিব।

প্রলয় কর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম শিব। কতককাল অতীত না হইলে কোন বস্তুর ধ্বংস অসম্ভব, অতএব শিবকে কাল ও মহাকালও বলে। যিনি সকল বস্তুর ধ্বংস কর্ত্তা তাঁহার আবার ধ্বংস কি? সুতরাং শিবের একটী বিশেষ নাম মৃত্যুঞ্জয়। বিশ্বকে ঈশ্বরের শরীর বলা হইয়াছে, তাই উহা মহাদেবেরও শরীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শিবোপাসকগণ মনে করেন ও সাধারণতঃও এই বিশ্বাস প্রবল দেখা যায় যে, মহাদেবের

ললাটে ও ভ্রূনিম্নে মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় তিনটী চক্ষু আছে। বাস্তবিক তাহা নহে, রবি, শশী ও হুতাশনই মহাদেবের ত্রিচক্ষু, সুতরাং তিনি ত্রিলোচন-পদবাচ্য। যথা শঙ্করাচার্য্য কৃত অপ-বাদ ভঞ্জন স্তোত্রে "বন্দে সূর্য্যশশাঙ্ক বহ্নিনয়নং" ইত্যাদি। তিন চক্ষু তিন প্রকারের বলিয়া মহাদেবের এক নাম বিরূ-পাক্ষ। জীর্ণদশায় প্রলয় ঘটে ও কালের বয়ঃক্রম অপরিমেয় বলিয়া মহাদেবের মূর্ত্তি বৃদ্ধ মনুষ্যের শরীরের ন্যায় কল্পিত হইয়া, তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদা বৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। চিতাভস্ম, শ্মশান ও নৃমুণ্ড প্রভৃতি ধ্বংস বা মৃত্যুর স্মারক বলিয়া ঐ সকলের দ্বারা তাঁহাকে পরিলক্ষিত করা হইয়াছে। ধ্বংস-কর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় সুতরাং তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রদর্শন জন্য তিনি বিষধর সর্পজড়িত বলিয়া বর্ণিত। মহাদেবরূপী কাল ও জড়-জগৎরূপী প্রকৃতি সংযোগেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, সুতরাং মহাদেব ও দুর্গানামধেয়া প্রকৃতিকে জগতের পিতা ও মাতা বলা হইয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ।" এই জন্য শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টেরও কল্পনা। শবশিবারূঢ়া কালীমূর্ত্তি, শক্তিহীন হইলে শিবের যে অবস্থা ঘটে তাহাই প্রদর্শন জন্য কল্পিত হইয়াছে। কালী মহাদেবের শক্তি, সুতরাং শিবের দেহ হইতে শক্তি পৃথক হইয়া বহির্ভূতা হইলে শিব শক্তিহীন সুতরাং শবাকার হইয়া পড়ে। শঙ্করাচার্য্য আনন্দ লহরীতে বলিয়াছেন "শিবঃ-শক্ত্যা-যুক্তো ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং। নচদেবং দেবোনখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" অর্থাৎ শিবের প্রভাব শক্তিযুক্ত থাকিলেই; নচেৎ তাঁহার স্পন্দন শক্তিও থাকে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের

প্রকৃতি খণ্ডেও ঐ কথা আছে। "শিবশক্তস্তয়া শক্ত্যাশবাকার স্তয়া বিনা।" অর্থাৎ শিব শক্তিসহ থাকিলেই শক্তিমান্, নচেৎ শবাকার হন। মহাদেবকে বৃষভবাহন বলার তাৎপর্য্য এই যে, কালের গতি বৃষভের গতির ন্যায় ধীর অথচ নিশ্চিত। মেঘই মহাদেবের জটাজূট, সুতরাং শিব-জটা হইতে গঙ্গার নির্গম হয় ইহার অর্থ এই যে, মেঘ হইতে জল নির্গত হয়। মহাদেবকে ভোলামহেশ্বর ও ধুস্তুরফলাদি ভক্ষণকারী বলার তাৎপর্য্য এই যে, কালকে অনেক সময় মদবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে দেখা যায়, যেমন দুর্য্যোধনের রাজ্যভোগ ও যুধিষ্ঠিরের বনবাস প্রভৃতি। মহাদেব বৃদ্ধ কিন্তু উমা নিত্য-যৌবনা, ইহার তাৎপর্য্য এই যে কাল একবার গত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না এবং উহার বয়ঃক্রমেরও অন্ত নাই, কিন্তু বসুন্ধরাদি বর্ষে বর্ষেই অভিনব বেশ ধারণ করে, ও একবার বসন্ত শেষ হইলেও উহা পুনঃ পুনঃ আগমন করিতে থাকে।

কাল শূন্যের অনুরূপ ও আচ্ছাদনবিহীন বলিয়া তাহাকে শ্বেতকায় ও দিগম্বর বলা হইয়াছে। মহাদেবকে আদিদেব বলার তাৎপর্য্য এই যে, সকলের পূর্ব্বেও কাল বিদ্যমান ছিল। সকলই কালে ঘটিতেছে, সুতরাং মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ, কালেই জ্ঞান লাভ হয় সুতরাং তিনি জ্ঞানদাতা, এবং যশস্বী মহাত্মাগণকে কাল জীবিতের ন্যায় রাখে সুতরাং তিনি ভক্তমুণ্ডমালী। মহাভারতে সুরথ সুধন্বার মুণ্ডগ্রহণ নিমিত্ত মহাদেবের যে আগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ভক্ত মুণ্ডমালী শব্দের বাচ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিতে হইবে।

অনন্ত বা শূন্যের বলরামরূপ কল্পনা করিয়া কালের কল্পিত-

রূপ মহাদেবের সদৃশ করা হইয়াছে। কোন একটি মনোহর শায়ী গানেও বলা হইয়াছে "তার পর একজন, বৃষভেতে আরোহণ, দাদা বলাইর মতন।" বাস্তবিক বলরাম ও মহাদেবের রূপে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অনন্ত কাল অনন্ত আকাশের সদৃশই বটে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে শিব ও দুর্গাকে পুরুষ ও প্রকৃতিও বলা হইয়াছে।

রুদ্রের অষ্ট প্রকার তনুও বর্ণিত আছে, যথা—সূর্য্য, জল, পৃথিবী, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্র। দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে জীব লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণু।

পালনকর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বর্ণিত। লক্ষ্মী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। বিষ্ণু চতুর্ভুজ কিন্তু গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কাল্পনিক রূপবিশিষ্ট গুণাতীত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দময়, কেহ তাঁহার শত্রু মিত্র নাই, তিনি পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ। মুরলী তাঁহার আনন্দময়ত্ব ব্যঞ্জক, উহা ধারণ করিয়া বাদ্য করিতে হইলে কেবল দুই হস্তেরই প্রয়োজন, সুতরাং তিনি দ্বিভুজ, কিন্তু পালনকারী সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণুকে সময়ে সময়ে অসুর সংহার কার্য্যেও ব্যাপৃত হইতে হয়, এই জন্য তাঁহাকে দ্বিভুজ বলিলে প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার আকার কল্পিত হয় না, সুতরাং তিনি চতুর্ভুজ। তাঁহার এক হস্তে গদা, এক হস্তে চক্র ও অন্য দুই হস্তে ক্রমান্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম। গদা ও চক্র বিগ্রহের ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু শঙ্খ ও পদ্ম শান্তিসূচক। বিষ্ণু পালন

কার্য্যের শত্রুদিগকে গদা ও চক্রের দ্বারা সংহার করেন, এই জন্য তাঁহার দুই অস্ত্র ও দুই হস্ত কল্পিত হইয়াছে। অবশিষ্ট দুই হস্তের কল্পনা পালন কার্য্যের ভাব প্রদর্শন জন্য। শঙ্খ দ্বারা শত্রু বিজয় ও পাল্য জীবদিগের প্রতি আশ্বাস বিঘোষিত হয়। পদ্ম পালনরূপ সুকুমার কার্য্যের ভাব প্রকাশ করে। বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অবিদ্যাবিজয়ঞ্চেমং শঙ্খরূপেন ধারয়।
অজ্ঞানচ্ছেদনার্থায় খড়্গাং তেস্তু তথাকরে॥
কালচক্রময়ং ঘোরং চক্রং ত্বং ধারয়াচ্যুত।
অধর্ম্ম রাজ ঘাতার্থং গদাং ধারয় কেশব॥
মালেয়ং ভূতমাতা তে কণ্ঠে তিষ্ঠিতু সর্ব্বদা।
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌচেমৌ চন্দ্রাদিত্যচ্ছলেনহ॥"

এই শ্লোকে শঙ্খকে অবিদ্যাবিজয় চিহ্ন ও খড়্গকে অজ্ঞান ছেদনাস্ত্র, কালকে চক্র, গদাকে অধর্ম্ম ঘাতনাস্ত্র, পঞ্চভূতকে পঞ্চরত্নবিশিষ্ট বৈজয়ন্তী মালা এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে ক্রমান্বয়ে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ বলা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে জীবাত্মা ক্ষীরোদশায়ী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিয়দংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গর্ভোদশায়ী এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কারণোদশায়ী। জীবাত্মাকে ক্ষীরোদশায়ী বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহা রক্তের পরিবর্ত্তিত আকার মনুষ্যের দেহস্থ ক্ষীর মধ্যেই শয়ান থাকে, ক্ষীর স্ত্রীশরীরে প্রকাশিতই হয়। সমষ্টি জীবদেহস্থ ক্ষীরকে সঙ্গত ভাবেই ক্ষীর সমুদ্র বলা যাইতে পারে। ক্ষীরোদ সাগরের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহার বিস্তারিত প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে না।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে জীবাত্মাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ধরা হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে একটী শ্লোক দিয়া তদানুষঙ্গিক কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।

পুরুষাবতারাঃ।

"প্রথমং মহতঃস্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

সংক্ষেপ ভাগবতামৃতে রূপ গোস্বামিধৃত নারদতন্ত্রবচনং।

"বিষ্ণু অর্থাৎ আদি সঙ্কর্ষণের পুরুষ নামে তিনটী রূপ আছে, তন্মধ্যে এক মহতের স্রষ্টা অর্থাৎ "সঐক্ষত বহুস্যাং" সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অনেক হইব, এই শ্রুতি উক্ত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির দ্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ বলিয়া কথিত হয়েন। দ্বিতীয় পুরুষরূপ অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ "তৎসৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ" এই শ্রুতি উক্ত সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পুরুষ। ইনি গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন নামক সর্ব্ব অবতারের মূল। তৃতীয় পুরুষ রূপ সর্ব্বভূতে অবস্থিত অর্থাৎ পদ্মোপরি অধিষ্ঠান-কর্ত্তা। ইনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। ইত্যাদি" (রামনারায়ণ বিদ্যা-রত্ন অনুবাদিত সংক্ষেপ ভাগবতামৃত)।

"স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যখন আদিদেব নারায়ণ অংশ অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন তখনই তিনি মহৎ স্রষ্টৃরূপ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।" (ঐ)

বিষ্ণুকে অতি সহিষ্ণু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা, একদা মুনিগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-

তম কে ইহা অবধারণ নিমিত্ত ভৃগুমুনিকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভৃগু প্রথমতঃ ব্রহ্মার সম্মুখে যাইয়া তাঁহার নানা নিন্দাবাদ করাতে ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিবের নিকটে গমন করিয়া শিবকেও ঐ প্রকারে নিন্দা করাতে শিবও তাঁহাকে শূলদ্বারা সংহার করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। পরিশেষে ভৃগুমুনি বিষ্ণুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নিন্দা করতঃ তদীয় বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। বিষ্ণু কোপান্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অতিশয় বিনয়ান্বিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন, আহা! আমার কঠোর বক্ষঃস্থলে আপনার চরণ যুগল প্রতিঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে আপনি বা কত যাতনাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। পালন কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহিষ্ণুই বটেন, নচেৎ তিনি কি প্রকারে জীবদিগকে পালন করিবেন।

রূপকে ধ্যানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহা সত্যযুগাবতীর্ণ ঈশ্বরের বা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্‌কে ব্রহ্মচারিবেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে—

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুং॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান্ চতুর্ব্বাহু বিশিষ্ট জটাযুক্ত বল্কলবসনধারী, দণ্ডকমণ্ডলু হস্ত, কৃষ্ণসারচর্ম্মযুক্ত, যজ্ঞ সূত্র ও অক্ষমালাধারী আকারে অবতীর্ণ হয়েন।

রূপকে যজ্ঞের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ত্রেতাযুগাবতীর্ণ ঈশ্বরমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। ত্রেতাযুগে যজ্ঞবাহুল্যই ইহার কারণ। যথা

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুকস্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়যুক্ত, স্বর্ণকেশ, বেদাত্মা ও স্রুক্ স্রুবাদি সংযুক্ত।

রূপকে সেব্য-পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে দ্বাপর-যুগাবতীর্ণ ঈশ্বরমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান্কে সেব্য-পুরুষের বেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা—

তং তদাপুরুষংমর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তিবেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপ॥

ধ্যান, যজ্ঞ, সেবা ও কীর্ত্তনকে ক্রমান্বয়ে শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধ্যান শ্রেষ্ঠতম, যজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর, সেবা শ্রেষ্ঠ এবং কীর্ত্তন এ সকলের নিম্নে। কীর্ত্তন কলিযুগের জন্য বিহিত। ঐ যুগে ভগবানকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মা।

সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, মরাল বাহন, কমণ্ডলু-হস্ত ও রুদ্রাক্ষমালাধারী বলিয়া বর্ণিত। চারি দিক্ই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ। সৃষ্টিকার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয় জন্য ধীরগামী হংস ইহাঁর বাহন বলিয়া কল্পিত। সৃষ্টি-কার্য্যে অনেক আলোচনা ও মনন করিতে হয়, সুতরাং জপ-নিরতত্ব ও ধ্যান পরায়ণতা প্রদর্শন জন্য ইনি কমণ্ডলু ও রুদ্রাক্ষ-মালাধারী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন। শাস্ত্র ইহাঁকে নারায়ণের নাভিপদ্ম জাত বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,

নাভির নিকটেই জননেন্দ্রিয় অবস্থিত এবং জননেন্দ্রিয় দ্বারাই উৎপাদকত্ব বা স্রষ্টৃত্ব সমুচিতরূপে সূচিত হয়। বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"তস্য সুপ্তস্য জঠরান্মহৎ পদ্মং বিনিঃসৃতং।
সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সসমুদ্রা সকাননা॥
তস্য মূলস্য বিস্তারং পাতাল তল সংস্থিতং।
কর্ণিকায়াং তথামেরু স্তন্মধ্যে ব্রহ্মণোভবঃ॥"

ঐ শ্লোকে পাতালতল সমেত পৃথিবীকেই নারায়ণের নাভি-জাত পদ্ম বলা হইয়াছে। রক্তবর্ণ অনুরাগ ব্যঞ্জক। সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই অনুরাগ পূর্ণ, সুতরাং ব্রহ্মা রক্তবর্ণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টির নাম মহাবিরাট্ ও তাহার অংশ বিশে-ষের নাম ক্ষুদ্র বিরাট্। এই ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে"যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতোলোক বিস্তরঃ" অর্থাৎ কয়েকটী ব্রহ্মাণ্ড একীকৃত করিলে যে আকার হয় তাহাই ব্রহ্মার আকার। যাহা হউক সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থে ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মা এইটীই মূল তাৎপর্য্য। বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার রূপ গোস্বামী সংক্ষেপভাগবতামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রহ্মাকে রজোগুণের অবতার বলিয়াছেন যেহেতুক সৃষ্টিকার্য্য রজোগুণের কার্য্য। যথা, "গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তেপুরুষাদিহ। বিষ্ণু-র্ব্রহ্মাচরুদ্রশ্চ স্থিতি সর্গাদি কর্ম্মণে॥" সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতং। বঙ্গীয় কবিকুল-চূড়ামণি ভারতচন্দ্র রায় শিবের বিবাহ সময়ে ব্রহ্মার মুখ দিয়া শিবের পরিচয় দেওয়াইয়াছেন যে, বরের নাম

হয়, বরের পিতার নাম স্মরহর এবং বরের পিতামহের নাম পুরহর। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সম্বন্ধেও এই ভাবের বর্ণনা আছে। অনেক সময় বিষ্ণুকে শঙ্করসেবিত ও বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত রত্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এক পরমেশ্বরই ত্রিবিধ শক্তি ভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারাই তিনি সেবিত ও বাঞ্ছিত ইহা বলিলে যে অর্থ হয়, বিষ্ণু শঙ্করসেবিত ও বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত এই কথা বলিলেও সেই অর্থই প্রকাশ পায়। তবে বিষ্ণুকে শঙ্করাদি সেবিত বলিলে রজঃ ও তমোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনই এক। সৃষ্টিতে অনুরাগ ভাব প্রকাশ করে, সুতরাং ব্রহ্মার রক্তবর্ণ, পালন কার্য্যে স্নিগ্ধতার ভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ, এবং সংহার কার্য্যে সমস্ত বিনাশ হইয়া একেবারে সকল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ পায় সুতরাং শিবের ধবল বর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

হরিহর ও হরগৌরী।

জগতে পালন কার্য্য ও সংহার কার্য্য বা উন্নতি ও হ্রাসের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই উভয়বিধ কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানে ঈশ্বরকে হরিহর নাম দেওয়া হইয়াছে। কোন স্থানে দেখা যায় যে, তরুরাজি নবপল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকীরণ করতঃ আপনাদের সম্পদের অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে, আবার তাহার অতি

নিকটেই দৃষ্ট হইতে পারে যে, কোন কোন বৃক্ষ শুষ্কপত্র সমন্বিত বা পুষ্পপল্লবাদি বিবর্জ্জিত হইয়া স্থাণুর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের হ্রাসের অবস্থা ও পূর্ব্বোক্ত তরুরাজির বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা পালন কার্য্য ও সংহার কার্য্যের নিদর্শন প্রদর্শন করে বলিয়া কবি কল্পনা অতি সুন্দর ভাবে হরিহর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছে। কেবল পরস্পর নিকটস্থ বৃক্ষেই যে বিপরীত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নহে, এক বৃক্ষেই নূতন ও পুরাতন পল্লবের সম্মিলন সন্দর্শন করিয়া আমরা কবি-কল্পিত হরহরির সম্মিলনের তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হই। কেবল উদ্ভিজ্জ রাজ্যেই নহে জগতের সমুদয় বিষয়েই নূতন ও পুরাতনের সম্মিলন দেখা যায়। জীবরাজ্যে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা এককালেই কতককে বর্দ্ধিষ্ণু ও কতককে হ্রসমান অবস্থায় দেখিতে পাই, কোথাওবা যুবকদল ও কোথাওবা বৃদ্ধ সমূহ এককালেই দুই প্রকার অবস্থায় নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। এক মনুষ্যের মস্তকেই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ বিরাজিত থাকিতে পারে। কোন মনুষ্যের সম্পদ বর্দ্ধিষ্ণু ও কাহার হ্রসমান, কেহ নবোদ্যমে সংসারে প্রবেশ করিতেছে, ও কেহ সংসারের গতি দেখিয়া স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া বিষণ্ণ ভাবে কাল যাপন করিতেছে। জগৎপাতা ইচ্ছা করিয়াছেন আমি অল্প পরিমিত স্থানে ও এককালেই দিন ও রাত্রির সমাবেশ দেখিব, তাই এক গ্রামেই বা এক বাটিতেই,এক সময়েই দিন ও রজনীর সমাবেশ দেখিতে পারা যায়। এক বাটীর ও এক গ্রামের লোকদিগের মধ্যে এক কালেই কাহারও কাহারও মনে বিষাদ তমস্বিনী, ও কাহারও কাহারও মনে সন্তোষ দিবোদয় হয়। সন্তোষ পালন কার্য্য সূচক ও বিষাদ সংহার কার্য্যের স্মারক, সুতরাং এ

প্রকার স্থলে কবি-কল্পিত হর হরির সম্মিলনের কথাই মনে পড়ে। হরিহর মূর্ত্তি এইরূপ সুন্দর ভাবে কল্পিত হইয়াছে।

"কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ॥
আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্ ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি॥
আধা তিলক আলোকে তিন লোক করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা॥
কিবা নলিন মলিন কারী নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গান আঁথি যেন রক্তোৎপল॥
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় গোপীমন।
আধা রুক্ষ অক্ষমালা আলো করে ত্রিভুবন॥
আধা কুঙ্কুম কস্তুরী হরি চন্দনে চর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম বিভূষিত॥" ইত্যাদি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা।

আবার হরগৌরীর একীভূত ভাবও জগতে বিরল প্রচার নহে। এটী হরিহর মূর্ত্তির এক প্রকার রূপান্তর মাত্র। পালন-ভাব প্রকাশক পদার্থ নিচয়কে সংহার ভাব প্রকাশক পদার্থা-বলীর সহিত সম্মিলিত করিয়া কবি কল্পনা হরিহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। আর শোভাময় পদার্থনিচয়ের সহিত হ্রসমান পদার্থ-নিকরের সংযোগ বিধান করিয়া একীভূত হরগৌরী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। বর্দ্ধিষ্ণু পদার্থ নিচয়েই শোভা থাকে। সুতরাং

সেই শোভাতে পালনকার্য্য মনে করিয়া হরি মূর্ত্তি আর কেবল শোভার ভাব মনে করিয়া গৌরী মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে হরগৌরীর একীভূত মূর্ত্তির একটী বর্ণনা দেওয়া গেল।

আধ বাঘ ছাল ভাল বিরাজে,
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ ফণি ফনা পরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরি রে॥
এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ,
এক হাতে শোভে মণি কাঞ্চন,
আধ মুখে ভাঙ ধুতুরা ভক্ষণ,
আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভাঙে ঢুলু ঢুলু এক লোচন,
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন,
আধই সিন্দূর পরি রে॥ ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র রায় কৃত অন্নদামঙ্গল।

সমাপ্ত।

A Free enquiry after truth. এই পুস্তক এ দেশীয় অনেক সংবাদ পত্র দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। সুলভ সমাচার ইহার সমালোচনা কালে বলিয়াছেন যে, এই পুস্তক মিলের গ্রন্থ এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে সুতরাং যে স্থলে মিলের সহিত ইহাতে ঐক্য দেখা গিয়াছে তাহা গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত। তাঁহার মতে ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই একপথে এক বিষয়ের চিন্তা করিতে ২ ভিন্ন ২ ব্যক্তি ও এক মিমাংসায় যাইয়া উপনীত হইতে পারে।

An Essay on happiness by Babu Kisori Lal Roy 221 Cornwallis Street. This is a thoughtful essay, very fairly written. The writer has long been known as one singularly fitted for philosophical speculation and his "free enquary after truth" is an evidence of his powers * * * It is a stimulating piece of work. Mr. Roy has written and we hope many a young man reading it will be inclined to be as profoundly thoughtful, as Earnest an Enquirer after truth and to live as pure and serious and dignified a life as the writer of this unpretentious Essay.

12 *November* 1883, *Indian Nation.*

Essay on Happiness by Babu Kisori Lal Roy. It is well-written and is worth a perusal.

Indian Echo.

An Essay on Happiness by Babu Kisory Lal Roy. The writer who has been employed in the Education department and latterly as tutor and guardian to the son of a public spirited and enlightened Zamindar of Rungpore has, in the work under notice, treated of social, moral and intellectual subjects and it must be remarked to his credit, that he has done so with great ability and facility of expression. There can be no question that he has brought out the work at some trouble. He is not sure if the work will be favorably receined by the public, but we certainly agree with him in thinking that he has spared no labor, to obtain their approbation.

Indian Mirror, February 23 1884.

এসে অন হাপিনেস। এ খানি ইংরাজিতে লিখিত। পুস্তক খানির রচনাও উৎকৃষ্ট, বিষয়গুলিও উৎকৃষ্ট। নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ মনুষ্যের উদ্দেশ্য, তাহার সুখ ও দুঃখ। ২ মিতাচার; বৈরাগ্য ও অমিতাচার। ৩ প্রতিরোধ। ৪ ক্রমোন্নতি। ৫ বহুজ্ঞতা। ৬ সামাজিক সুখ।

সুন্দর সুখই স্বর্গ, স্বর্গই সুন্দর সুখ, আমাদের মতে সুখের ইহার অপেক্ষা পরিস্কার অর্থও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনুষ্যের দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার সংমিলনই প্রকৃত সুখ, হিন্দু-শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন, বাসনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, বাসনা ত্যাগ করাই যথার্থ সুখ, পাশ্চাত্য 'গ্রন্থকারদিগের মতে সুখের বিবিধ কারণ নিরূপণ

হইয়া থাকে। কেহ পার্থিব সুখ, কেহ পরমার্থ সুখকেই পরমসুখ বলিয়া থাকেন। ইহ ভিন্ন সুখের প্রকৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না।

সোমপ্রকাশ, ২১ ফাল্গুন ১২৯০ সাল।

An Essay on Happiness by Kisori Lal Roy. কি করিলে মানুষ সুখি হইতে পারে, গ্রন্থকার বিজ্ঞতার সহিত তাহা, সাধারণের উপকারের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিশোরী লাল বাবু চিন্তাশীল ধার্ম্মিক লোক, তাঁহার পুস্তক পড়িতে আমরা খুব ভালবাসি। এই প্রবন্ধটী পড়িয়াও আমরা সুখী হইলাম। দুঃখ এই রহিল, এ পুস্তক স্বদেশের অনেকেই বুঝিবে না। কিশোরী বাবুর ন্যায় লোকের বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে দেশের উপকার হইবে—দেশের উপকার হইলে তাঁহার ও লাভ হইবে।

নব্যভারত,
২০ চৈত্র ১২৯০ সাল।

মনুষ্যের উদ্দেশ্য, সুখ দুঃখ মিতাচার প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিশোরী বাবু শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কেবল মানসিক শিক্ষার বিস্তারে লিপ্ত ছিলেন না, মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে তদ্বিষয়েও মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি বেশ বিশদ হইয়াছে।

চারুবার্ত্তা,
২৬ চৈত্র ১২৯০ সাল।]

We acknowledge with thanks the receipt of a copy of "An Essay on Hapiness" by the author, Mr. Kisori Lal Roy, who is also the author of " A free Inquiry after Truth." It "is not less than ten years ago," he says, that this Essay was "originally composed " during which time it has seen many modifications and alterations. "It is now presented to the public under a sense of duty and the pressure of an anxiety for the possible loss " of the author's " mental labour." The Essay is divided into seven chapters, the first of which is " On the object of Man, his happiness and misery." The second chapter opens " On temperance, abstinence, and excess, " in which Mr. Roy animadverts upon the different passions of man, such as anger, pride, impatience of superiority, revenge, hatred. " The excess, however, " he says, " of the passions are far more injurious than abstinence, which is a negative sort of excess. " The third chapter is devoted. " On the Golden Mean, " in which the writer says :—It is, in short, the moderate use of our powers which lends them vigour and is conducive to our happiness. The dominion of right reason should be firmly established in the mind, or else it would be surely distracted by the various passions and prejudices—Our supreme affection must be placed on the Supreme Being before we can be really happy. In this world of tribulation and sorrow the man is truly miserable whose heart does not enjoy the sure prospect of consolation and contentment in

eternity." The fourth chapter has been devoted on the defferent opposite principles of man and nature, the fifth on "Progression, Graduality ;" and the sixth on variety and Similarity. The last chapter is on "Good Men and Social Joys." The essayist says:—"A good man is a loving husband, a dutiful son, a fond father, an affectionate brother, a dear friend, and a benevolent neighbour. His commerce with his fellow-creatures is always regulated by justice and love, and is in consequence agreeable to all." Taken as a whole, the essay is well written ; and the author, a native of India deserves credit for his English rendering. It is dedicated to Roy Mahima Ranjan Chowdury, a Zemindar of Kakina in Rungpore.

THE INDIAN SELECTOR.
Bombay:—Septembor, 1884.

An Essay on Happiness by Kisori Lal Roy, printed and published by M.L. Mandal at the Gupta Press, 221 Cornwallis Street Calcutta. The author is not happy in his choice of the title for this book. It has much more than what an essay on hapiness can be expected to contain. In the first chapter the author endeavours to show that the ultimate object of men is happiness for which adequate provision is made in the world, and that the bulk of mankind's miseries proceeds from themselves. In the second chapter he traces the wrongs occasioned in the world to the abuse of passions, affections and the desires of

humanity. In the third chapter is pointed out the right use of the human mind as the golden mean of securing happiness. In the fourth chapter it is shown that the human mind is propelled in the line of its movements by the double, but antagonistie selfish and sympathetic feelings as the world is carried on its orbit round the sun in virtue of the centripetal and centrefugal forces. In the fifth chapter it is shown that human progress is gradual as is the case with every thing else in nature. In the sixth chapter is proved that in nature similarity is combined with variety. In the seventh and concluding chapter is held that good men are the favorites of heaven, ornament of the world and the minister of happiness. We are so much charmed with the book that we have no hesitation to recommend it to the earnest and thoughtful perusal of all who are deeply interested in the happiness of mankind.

The Arya Magazine.

November, 1884. (*Lahore.*)